

ইসলাম ও নেতৃত্ব শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

Bm̄j vg | ^bWZK w̄kP̄v

Aog tk̄N

রচনা

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

ড. মোহাম্মদ ইউচুফ

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ

ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

m̄p̄w` bv

ডষ্ট্রে মো. আখতারুজ্জামান

মুহাম্মদ তমীয়ুদ্দীন

RiZxq w̄kP̄vug | cW'c̄y-K teW© XvKv

RivZxq wKPiug | CW'cy-K teW©

69-70, gZiSj ewYiR'K Gj viVi, XviKi-1000

KZR cKwKZ |

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামণক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

CW'cy IK প্রণয়নে সমঘাতক

রেবেকা সুলতানা লিপি

মোঃ আনিছুর রহমান

KiñúDUvi KfñúR
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা.) লিঃ

CQ
সুদর্শন বাচার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপাঠ্যক্রম বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

gy fY:

CII•M-K_V

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোত্তমুখী উন্নয়নের CERZ^৩ আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমন্বিত দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অস্তিনিহিত মেধা ও সম্ভাবনার CWIC⁴ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক -fii অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে DPZI শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ -fii শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত CULfigi প্রক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক -fii শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক gj⁵ fera থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্মান্দাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃে Z⁶ প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ei⁷-eqfb শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রগতি হয়েছে মাধ্যমিক -fii CIIq mKj CWcij-K। উক্ত CWcij-K প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও CIE⁸ অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। CWcij-K, fji vi বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঞ্জিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে gj⁹ qfb¹⁰ K সৃজনশীল করা হয়েছে।

ইসলামের মূল স্তুতি ও বিধানসমূহ শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। একবিংশ শতকের এই সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাপ্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, উদারতা, শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে CWcij-K¹¹U রচিত হয়েছে। কাজেই CWcij-K¹¹i আরও সমন্বিতসাধনের জন্য যে কোনো MVbjgj K ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। CWcij-K¹¹U প্রণয়নের বিপুল কর্মাঙ্গের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে cij¹² K¹¹U রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলগুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে CWcij¹³ K¹¹U¹⁴K আরও সুন্দর, শোভন ও ত্বরিতমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

CWcij¹⁵ K¹¹U i Pbv, mpuv¹⁶ b, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। CWcij¹⁷ K¹¹U শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

cIIdm¹⁸ tgvt tgvt-dv Kvgv¹⁹ Dvii²⁰ b
tPqvi g²¹b
RiZiq²² K²³ mug | CWcij-K teW²⁴ XvKv

mPc†

Aāvq	Aāv̄qi wk̄ti v̄b̄v̄g	c̄v̄
c̄g	AvKvB` (الْعَقَائِدُ)	1-24
w̄Zxq	Bv` Z (الْعِيَادَةُ)	25-45
ZZxq	কুরআন nw̄ m wk̄v̄	46-80
PZl [©]	AvLj v̄K (الْأَخْلَاقُ)	81-104
c̄Ag	Av` k̄RxebPw̄i Z	105-128

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقِيدَة)

পরিচয়

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম মৌলিক কতিপয় বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলা, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের এরূপ মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর বিশ্বাসকে আকাইদ বলা হয়। আকাইদ শব্দটি বহুবচন। একবচনে ‘আকিদা’ যার অর্থ বিশ্বাস। আকাইদের বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো একটিকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না। অতএব, আকাইদ হলো ইসলামের প্রধান ভিত্তি।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- ইমানের পরিচয় ও তৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ইমানের প্রধান সাতটি বিষয় الْمُؤْمِنَة করতে পারবে।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়ের প্রতি অটল বিশ্বাস (ইমান) স্থাপন ও অনুশীলনে উদ্বৃদ্ধ হবে।
- নিফাকের (কপটতা) পরিচয় ও এর কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নিফাক পরিহার করার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- কপটতাতে K আচরণ পরিহার করে চলতে আগ্রহী হবে।
- আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহান আল্লাহর গুণবাচক নামে বিধৃত গুণ নিজ আচরণে প্রতিফলনে আগ্রহী হবে।
- রিসালাতের অর্থ ও তৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নবুয়তের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নবুয়ত ও রিসালাতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আখিরাত ও কিয়ামত $\text{الْيَوْمَ الْعَظِيم}$ করতে পারবে।
- শাফাতাতের পরিচয় ও তৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- জাহানাতের পরিচয় ও তা লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- জাহানামের পরিচয় ও স্বরূপ এবং জাহানাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- নেতৃত্ব চরিত্র গঠনে ইমানের الْعَقِيدَة বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাঠ ১

ইমান (ত্বরণ)

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের gj বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই ইমান বলা হয়। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলা, নবি-রাসূল, ফেরেশতা, আখিরাত, তাকদির ইত্যাদি বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়াই হলো ইমান। যে ব্যক্তি এসব বিষয়কে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তিনি হলেন মুমিন।

ইমানের তিনটি দিক রয়েছে। এগুলো হলো-

- ক. অন্তরে বিশ্বাস করা।
- খ. মুখে স্বীকার করা এবং
- গ. তদনুসারে আমল করা।

অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করার নাম হলো ইমান। প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য এ তিনটি বিষয় থাকা জরুরি। কেউ যদি শুধু অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার না করে তবে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার বা মুমিন হিসেবে গণ্য হয় না। আবার মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলেও কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারে না। e-īlā আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমলের সমষ্টিই হলো প্রকৃত ইমান।

ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ

ইমান বা বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় মোট সাতটি। মুমিন হওয়ার জন্য এ সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমরা C'eef শ্রেণিতে ইমানে মুফাসসাল maf'ū K'জেনেছি। তাতে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ পাঠে আমরা ll e-īlā Zfīt'e এ সাতটি বিষয় maf'ū K'জানব।

১. আল্লাহর প্রতি C'eef বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের রব, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী, জল্ল ও gjii মালিক। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি পবিত্র, ক্ষমাশীল, দয়াবান, পরম দয়াময়, সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান, সর্বদৃষ্টি ও সর্বশক্তিমান। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং maf'ū ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা অনন্ত অসীম। তিনি সবসময় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি AZj bxq। তিনি ঠিক তেমনই যেমনভাবে তিনি বিরাজমান। তাঁর অসংখ্য সুন্দর নাম রয়েছে। তাঁর পিতা, পুত্র এবং -x। নেই। তিনিই একমাত্র সত্তা। তাঁর সমকক্ষ, mgZj" বা শরিক কেউ নেই। mg-ī প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ তাআলাকে তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও সকল ক্ষমতাসহ বিশ্বাস করাই হলো ইমানের সর্বপ্রধান বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার যিকর ও তাসবিহ পাঠে রংত। তাঁরা আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত।

ফেরেশতাগণ অদৃশ্য। তবে আল্লাহর আদেশে তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা পুরুষ নন আবার নারীও নন। তাদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন নেই। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউই তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা জানে না। ফেরেশতাগণের মধ্যে ৪ জন হলেন প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন হ্যরত জিবরাইল (আ.), হ্যরত মিকাইল (আ.), হ্যরত আযরাইল (আ.) এবং হ্যরত ইসরাফিল (আ.)।

৩. আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রাসূলগণের নিকট আসমানি কিতাব নথিল করেছেন। এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণীসমষ্টি। এসব কিতাবে আল্লাহ তাআলা স্মীয় পরিচয় ও ক্ষমতার বর্ণনা প্রদান করেছেন। মানুষের জীবনযাপনের জন্য নানা আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন। এ কিতাবগুলো আসমানি কিতাব নামে পরিচিত। আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূলগণের মাধ্যমে এসব কিতাব আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন।

আসমানি কিতাব সর্বমোট একশত চার (১০৪) খানা। তন্মধ্যে ১০০টি ছোট। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর বাকি ৪ খানা বড়। এগুলো হলো- তাওরাত, যাবুর, ইনজিল ও কুরআন। আল কুরআন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় সন্তুষ্টিপূর্ণভাবে পরিচিত রয়েছে। এটি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ তথা *Cußl Cuzzl* জীবন-বিধান।

৪. নবি-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন। তাঁরা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিতেন। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে তা দেখিয়ে দিতেন। নবি-রাসূলগণ ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। তাঁরা ছিলেন *Wūlīc*। *Mūlūkij*। মধ্যে তাদের সম্মান ও মর্যাদাই সর্বাধিক।

সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হ্যরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালিন বা রাসূলগণের সর্দার। তিনি আমাদের নবি, ইসলামের নবি। আমরা তাঁরই উম্মত।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত হলো পরকাল। দুনিয়ার জীবনের পর মানুষের আরও একটি জীবন রয়েছে। এ জীবন স্থায়ী ও অনস্তুকালব্যাপী। এটাই হলো পরকাল। আখিরাত বা পরকালের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। কিয়ামত, কবর, হাশর, মিয়ান, সিরাত, জাহানাত, জাহানাম ইত্যাদি আখিরাত জীবনের একেকটি । আখিরাত হলো কর্মফল ভোগের । মানুষ দুনিয়ার জীবনে যেমন কাজ করবে আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে। ভালো কাজ করলে আখিরাতে *Cj* পাবে। তার স্থান হবে জাহানাম। আর যে খারাপ কাজ করবে সে *Kw* ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে জাহানাম।

৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদির অর্থ ভাগ্য। তাকদির আল্লাহ তাআলা থেকে নির্ধারিত। ভালো-মন্দ যা **K**oহয় সবই আল্লাহ তাআলার হুকুমে হয়। সুতরাং দুনিয়াতে ভালো **K**oভ করলে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না। বরং এটি আল্লাহরই দান। তাই আল্লাহ তাআলার শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অন্যদিকে বিপদে-আপদে বা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হলে হতাশ হওয়া যাবে না। অন্যায় ও দুর্বীলি করা যাবে না। বরং এটিও আল্লাহ তাআলার তরফ থেকেই এসেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সবর বা ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। অতএব, আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করব এবং সাধ্যমতো নেক কাজ করব।

৭. gZii পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

gZii পর আমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে। দুনিয়ার প্রথম মানব হ্যরত আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলকেই আল্লাহ তাআলা জীবিত করবেন। একেই বলা হয় পুনরুত্থান। এ সময় সবাই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন প্রত্যেকের নিকট নিজ নিজ আমলের হিসাব চাইবেন। আমাদের সেদিন তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সেখানে পাপ-পুণ্যের ওজন করবেন, হিসাব নেবেন। তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। অতঃপর ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য **K**o¹ দেওয়া হবে।

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করলে আমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারব।

ইমান আনার শুভ পরিণাম

ইমান আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। ইমানের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আধিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারে। মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে শ্রদ্ধা, সম্মান, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেন। সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلِلّهِ الْعَزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: “আর সম্মান তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্যই।” (সুরা আল-জুমা Kb, আয়াত ৮)

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ভালোবাসেন। আধিরাতে তিনি মুমিনদের চিরশাস্তির জান্মাত দান করবেন। মুমিনগণ সেখানে চিরকাল থাকবেন। জান্মাতের সকল নিয়ামত তোগ করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا حَالِلِينَ فِيهَا

অর্থ : “নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস জান্মাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (সুরা আল-কাহাফ, আয়াত ১০৭-১০৮)

আমরা ইমানের প্রতিটি বিষয় **M**u¹**K**¹ভালোভাবে পড়ব। এ **M**u¹**K**¹জানব এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অতঃপর এগুলোর অনুসরণ করে নিজ জীবন গড়ে Zje। আমরা সবসময় নেক কাজ করব। কখনো অন্যায় ও অত্যাচার করব না। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আধিরাতে শাস্তি ও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

- ক. ইমানের সাতটি বিষয় লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
- খ. ইমানের সাতটি বিষয়ের বিবরণ বাড়ি থেকে খাতায় লিখে এনে শিক্ষককে দেখাবে।
- গ. দলে বিভক্ত হয়ে ইমান আনার কী কী শুভ পরিণাম রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ২**নিফাক (النِّفَاقُ)****পরিচয়**

নিফাক শব্দের অর্থ ভূমি, কপটতা, প্রতারণা, দ্বিমুখী নীতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মুখে ইমানের স্বীকার ও অন্তরে অবিশ্বাস করাকে নিফাক বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় মুনাফিক। মুনাফিকরা সাধারণত সামাজিক ও পার্থিব লাভের জন্য এরূপ করে থাকে। তারা মুসলমান ও কাফির উভয় দলের সাথেই থাকে। প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে। কিন্তু গোপনে তারা ইসলামকে অস্বীকার করে। তাদের অবস্থা **ঘাস্তিK**আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنُوا قَالُوا إِنَّا مَنَّا ۝ وَإِذَا حَلَوْا إِلَى شَيْطَنِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ ۝ إِنَّمَا نَحْنُ
○ مُسْتَهْزِئُونَ

অর্থ: “যখন তারা (মুনাফিকরা) ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে নিশ্চয়ই আমরা ইমান এনেছি। আর যখন তারা গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।” (সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৪)

এক কথায় অন্তরে Kdর রেখে মুখে মুখে ইমানের কথা প্রকাশকে নিফাক বলে। আর এরূপ প্রকাশকারী হলো মুনাফিক।

মুনাফিকদের চরিত্র

নিফাক হলো নৈতিকতা ও মানবিকতার আদর্শের বিপরীত কাজ। মুনাফিকদের চরিত্র দেখলে আমরা এ সত্য জানতে পাই। তারা সবধরনের অন্যায় ও মন্দ কাজ করে থাকে। উত্তম আচরণ ও উত্তম চরিত্র তারা কখনোই অনুশীলন করে না। বরং মিথ্যা ও প্রতারণাই তাদের প্রধান কাজ। আল্লাহ পাক বলেন-

وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

অর্থ: “আর আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।” (সুরা মুনাফিকুন, আয়াত ১)

রাসুলুল্লাহ (স.) বহু হাদিসে মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

أَيْهُ الْمُنَافِقِيْ ثَلَاثٌ إِذَا حَلَّتْ كَذَبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْمِنَ خَانَ

অর্থ : মুনাফিকের নির্দর্শন তিনটি । যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং যখন তার নিকট কোনো **W**KO_l গচ্ছিত রাখা হয় তখন তার খিয়ানত করে । (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

নিফাকের কুফল ও পরিণতি

নিফাক জঘন্যতম পাপ । এটা মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে ফেলে । নিফাকের ফলে মানুষ অন্যায় ও অশ্রীল কাজে Af^۱ হয়ে যায় । ফলে মানুষের নেতৃত্ব ও মানবিক gj^۲te^۳ বিনষ্ট হয় । নিফাকের দ্বারা মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় । ফলে মানব সমাজে মারামারি, হানাহানি ও অশাস্তির সৃষ্টি হয় ।

মুনাফিকরা ইসলামের চরম শত্রু । এরা বাইরে মুসলমান বলে দাবি করে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কাফিরদের পক্ষে কাজ করে । এদের গোপন শত্রুতা মুসলমানদের বিপদে ফেলে । এ শত্রুরা গৃগত হিসেবে কাজ করে । ইসলাম ও মুসলমানদের গোপন কথা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয় । এরা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য ও মারামারি সৃষ্টির চেষ্টা করে । প্রকাশ্য শত্রুর Zj b^۴q গোপন শত্রু বেশি ক্ষতিকর । কেননা প্রকাশ্য শত্রুর বিবুদ্ধে AvZ^۵i ^۶qj K ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় । কিন্তু যে গোপনে শক্রতা করে তাকে চেনা যায় না । তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষা করারও সুযোগ পাওয়া যায় না । ফলে সে eU^۷ বেশে সহজেই বড় ক্ষতিসাধন করতে পারে । এসব কারণে দুনিয়াতে মুনাফিকরা ঘৃণিত ও নিন্দিত হয় । আধিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আয়াব । আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّاسِ

অর্থ : “নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান জাহানামের সর্বনিম্ন -۱۱|۰ (সুরা আন-নিসা, আয়াত ১৪৫)

আমরা সকলেই নিফাক থেকে বেঁচে থাকব । হাদিসে যেসব কাজ মুনাফিকের নির্দর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে আমরা সেগুলো বর্জন করব । খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবনযাপনের চেষ্টা করব ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

- ক. দলে বিভক্ত হয়ে মুনাফিকের নির্দর্শনগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে ।
- খ. নিফাকের কুফল ও পরিণতি **W**K_۹০টি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে ।

পাঠ ৩

আসমাউল হুসনা (az̄-smā'u-l ḥusnā)

আসমাউল হুসনা শব্দের অর্থ সুন্দর blgmgm^۱ | ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাগmgn^۲K একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয় । আল কুরআনে আল্লাহ তাআলার এরূপ বহু গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে । হাদিস শরিফে আল্লাহ তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নামের কথা বলা হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম অসংখ্য । তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হলো ৯৯টি নাম । যেমন- আলিম, খাবির, রায়্যাক, গাফ্ফার, রাহিম, রাহমান ইত্যাদি ।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নামগুলো তাঁর পরিচয় ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়। এ নামগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে সহজ হয়।

এ নামগুলোর দ্বারা আমরা আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে পারি। তিনি এসব নামে ডাকলে খুশি হন। এসব নাম ধরে আমরা মুশায়াত করতে পারি। তিনি স্বয়ং বলেছেন-

وَإِلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَاٰ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي إِسْمَائِهِ سَيِّجُرَوْنَ مَا كَانُوا
○ يَعْمَلُونَ

অর্থ : “আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর bigmgn। সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সকল নাম দ্বারাই ডাকো। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করো। অচিরেই কৃতকর্মের ফল তাদের প্রদান করা হবে।” (সুরা আল-আরাফ, আয়াত ১৮০)

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক bigmgn আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তাআলার এসব গুণ অর্জনের জন্য মানুষ তার জীবনে চর্চা করলে সংচরিত্রিবান হয়। সমাজে নেতৃত্ব ও মানবিক gj "fela প্রতিষ্ঠিত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে-

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

অর্থ : “আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রং, আর রঙে আল্লাহ অপেক্ষা আর কে অধিকতর সুন্দর?” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৩৮)

আল্লাহর রং হলো আল্লাহর দীন ও তাঁর গুণাবলি। আর সর্বোত্তম গুণাবলিতো আল্লাহরই। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলির অনুসরণ করলে উত্তম চরিত্রবান হওয়া সম্ভব। নিম্নবর্ণিত এ পাঠে আমরা আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণের সাথে পরিচিত হব।

আল্লাহু গাফ্ফারুন (‘الله غفارٌ)

গাফ্ফার শব্দের অর্থ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহু গাফ্ফারুন অর্থ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তাআলার ক্ষমা অপরিসীম। তিনি সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল। তিনি বলেন-

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَمَنْ وَعَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى
○

অর্থ : “আর আমি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল তাদের প্রতি যারা তাওবা করেছে, ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অতঃপর সে সৎপথে অবিচল থাকে।” (সুরা তা-হা, আয়াত ৮২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের বহু নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই অহংকার ও gLQiekZ আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তিনি তৎক্ষণাত তাকে kW-ী দেন না, বরং সুযোগ দেন। বান্দা যদি তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তাওবা করে তবে তিনি মাফ করে দেন। বড় বড় পাপীও যদি তাওবা করে তাহলেও তিনি ক্ষমা করেন। তার ক্ষমা Zj bnxlb।

আমরা জানা-অজানায় অনেক গুনাহ করে ফেলি। তাই সবসময় আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব। তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ সামাদুন (الْمَوْلَى)

সামাদুন শব্দের অর্থ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ সামাদুন অর্থ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি *الْمَوْلَى* আল কুরআনে তিনি নিজেই বলেছেন- *الْمَوْلَى* অর্থ: “আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।” (সুরা আল-ইখলাস, আয়াত ০২)

আল্লাহ তাআলা খালিক বা সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত *meekOB* মাখলুক বা সৃষ্টি। সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা সবকিছুর জন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার কুদরতের মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রয়োজন ও চাহিদার উর্ধ্বে। সকল প্রকার লাভ-লোকসান, ক্ষয়-ক্ষতি, দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত বা পবিত্র। বিশুজগৎ সৃষ্টিতে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয় নি। সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও তাঁর কোনো সাহায্যকারীর দরকার নেই। বড় বড় সাগর মহাসাগর, পাহাড় পর্বত তাঁর এক হুকুমেই তৈরি হয়ে যায়। জটিল জটিল সৃষ্টিও তাঁর ‘হও’ বলার সাথে সাথে *Allāh* লাভ করে। সুতরাং তিনি সাহায্যকারী ব্যতীতই মহান সুষ্ঠো।

তাঁর কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। এমনকি ইবাদত বন্দেগি ও প্রশংসারও তিনি মুখাপেক্ষী নন। মানুষের নিজের কল্যাণের জন্যই ইবাদত বন্দেগি করা প্রয়োজন। তিনি খাদ্য-পানীয়, নির্দ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদির উর্ধ্বে। এক কথায় তিনি স্বয়ং *Alī* অমুখাপেক্ষী একমাত্র সত্তা।

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণ উপলব্ধি করব। নিজে নিজে *Alī* হওয়ার চেষ্টা করব। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করব। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য চাইব না।

আল্লাহ রাউফুন (رَءُوفٌ لِّلَّهِ)

রাউফুন শব্দের অর্থ অতিশয় দয়াবান, পরম দয়ালু, অতি স্নেহশীল। আল্লাহ রাউফুন অর্থ- আল্লাহ অতি দয়াবান, অত্যন্ত স্নেহশীল। আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার শেষ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৪৩)

আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার শেষ নেই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি দয়া ও স্নেহের মাধ্যমে আমাদের প্রতিপালন করেন। তিনি মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মায়া-ভালোবাসা *Alī* করে দেন। তাঁরা আমাদের সেবা দিয়ে বড় করেন। আমরা নাফরমানি করলেও তিনি দুনিয়াতে আমাদের তৎক্ষণাত *Alī* দেন না। বরং করুণাবশত আমাদের সুযোগ দেন। আমরা তাওবা করলে তিনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করেন। আমাদের রহমত ও বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণই তাঁর দান। তিনি করুণা ও দয়ার আধার।

আমরাও আল্লাহ তাআলার এ গুণের চর্চা করব। **Ci-ঃঃ॥**। প্রতি আমরা দয়াশীল হব। কাউকে আঘাত করব না। বরং স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে সকলকে আপন করে নেব।

আল্লাহু হাসিবুন (الله حسِيبٌ)

হাসিবুন অর্থ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহু হাসিবুন অর্থ আল্লাহ হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

○**إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا**

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।” (সুরা আন-নিসা, আয়াত ৮৬)

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মানুষের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। হাশরের ময়দানে তিনিই হবেন একমাত্র বিচারক। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

অর্থ : “তিনি (আল্লাহ) বিচার দিনের মালিক।” (সুরা আল-ফতীহা, আয়াত ৩)

সেদিন তিনি সকল মানুষের হাতে আমলনামা প্রদান করবেন। আমলনামায় প্রত্যেকের সব কাজের হিসাব লেখা থাকবে। ছোট-বড়, B"Qiq-Awl"Qiq, গোপনে-প্রকাশ্যে কৃত সবধরনের কাজেরই সেদিন হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنْ تُبْدِلُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ إِعْجَاجِي سِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ طَ

অর্থ : “যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তারও হিসাব নেবেন।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৪)

সকলকেই সেদিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। পাপ **CjY**। হিসাব না দিয়ে সেদিন কেউই রেহাই পাবে না। আল্লাহ তাআলা **CjLbjcyl** ভাবে সকলেরই হিসাব নেবেন। এজন্যই তিনি হাসিব বা গুরু হিসাবগ্রহণকারী।

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণটির তৎপর্য বুঝাব। তারপর নিজেই নিজ আমলের হিসাব রাখব। প্রতিদিন রাতে ঐ দিনের পাপ-**CjY**। হিসাব করব। অতঃপর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং ভবিষ্যতে পাপ আর না করতে চেষ্টা করব।

আল্লাহু মুহাইমিনুন (الله مُهْمَنْ)

মুহাইমিনুন শব্দের অর্থ নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আশ্রয়দাতা। আল্লাহু মুহাইমিনুন অর্থ আল্লাহ আশ্রয়দাতা। আল্লাহ তাআলা হলেন প্রকৃত রক্ষাকর্তা। তিনিই একমাত্র এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তাআলাই আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তিনিই হেফায়ত করেন। হিংসুক, যাদুকর, ষড়যন্ত্রকারী, সকলের অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর সুরক্ষাই প্রকৃত সুরক্ষা। কেউ তাঁর সুরক্ষা ভেদ করতে পারে না। তিনি যাকে রক্ষা করেন কেউ তার কোনো

অনিষ্ট করতে পারে না। সবসময় সকল বিপদে তাঁরই আশ্রয় চাইতে হবে। আল কুরআন ও হাদিসের বহুস্থানে আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) তাঁর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। আমরা IEC` M^o K সাহায্য করব, আশ্রয় দেব। ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর খুশি হবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর ১৫টি গুণবাচক নাম অর্থসহ একটি তালিকা C^o P^Y করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

রিসালাত (رِسَالَةٌ)

আকাইদের *el qmgi ni* মধ্যে রিসালাত অত্যন্ত রূত্পূর্ণ। তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত অর্থ সংবাদ বহন, খবর বা চিঠি পৌছানোকে রিসালাত বলে। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার বাণী, আদেশ-নিয়ে মানুষের নিকট পৌছানোকে রিসালাত বলে। যাঁরা এ সংবাদ পৌছানোর কাজ করেন তাঁরা হলেন নবি-রাসূল। রিসালাত ও নবি-রাসূলের ওপর বিশ্বাস করা ফরয বা আবশ্যক।

নবি-রাসূলের সংখ্যা

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদয়াতের জন্য বহু নবি-রাসূল এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি ছিল না যেখানে আল্লাহ তাআলা নবি-রাসূল প্রেরণ করেন নি। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِيٌ

অর্থ : “আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।” (সুরা আর-রাদ, আয়াত ৭)

কুরআন মাজিদে আমরা মাত্র ২৫ জন নবি-রাসূলের নাম দেখতে পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। একটি হাদিসে হ্যরত আবুজর গিফারি (রা.) বলেন, ‘একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবিগণের সংখ্যা কত? উত্তরে মহানবি (স.) বললেন, এক লক্ষ চবিষ্ণব হাজার। তন্মধ্যে তিন শত তের জন অপর বর্ণনা মতে তিন শত পনের জন হলেন রাসূল।’ (মিশকাত)

আরেক বর্ণনা মতে নবিগণের সংখ্যা হলো দুই লক্ষ চবিষ্ণব হাজার। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হ্যরত আদম (আ.), আর সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)।

নবি-রাসূলের পার্থক্য

অর্থগত দিক থেকে এ দুটি শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যাঁদের প্রতি আসমানি কিতাব নায়িল করেছেন কিংবা bZb শরিয়ত প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রাসূল। আর যার প্রতি কোনো কিতাব

অবতীর্ণ হয় নি কিংবা যাঁকে কোনো bZb শরিয়ত দেওয়া হয় নি তিনি হলেন নবি। তিনি তাঁর CEHQZP রাসুলের শরিয়ত প্রচার করতেন। এ হিসেবে সকল রাসুলই নবি ছিলেন। কিন্তু সকল নবি রাসুল ছিলেন না। যেমন- আমাদের মহানবি (স.) ছিলেন একাধারে নবি ও রাসুল। অপরদিকে হযরত হারুন (আ.) ছিলেন মাত্র নবি। তাঁর প্রতি কোনো কিতাব নাফিল হয় নি। তিনি হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন।

রিসালাতের মর্ম

নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। তারা সকলকে তাওহিদের পথে ডাকতেন। কুফর, শিরক, নিফাক থেকে সতর্ক করতেন। উত্তম চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতেন। নবিগণের দাওয়াতের gj K_। আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর বিধি-বিধান প্রচার করা। এ MpuK®আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ : “হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।”
(সুরা আল-আরাফ, আয়াত ৭৩)

নবি-রাসুলগণের দায়িত্বকেই বলা হয় রিসালাত। এ রিসালাতের মর্ম বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا إِنَّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الظَّاغُونَ

অর্থ: আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি। (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার দেওয়া এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। যারা তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে তারা সফলকাম হয়েছে। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (স.) এর আনীত বিধান অনুসরণ করব তাহলে আমরাও সফলকাম হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা রিসালাত পাঠটি নীরবে পড়বে অতঃপর রিসালাতের মর্ম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

খতমে নবুয়ত

খতম শব্দের অর্থ শেষ, সমাপ্ত, আর নবুয়ত অর্থ পয়গাঞ্চারি, নবিগণের দায়িত্ব ইত্যাদি। সুতরাং খতমে নবুয়ত অর্থ নবিগণের দায়িত্বের পরিসমাপ্তি বা নবুয়তের সমাপ্তি। মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। এ ক্রমধারা শুরু হয় হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে, আর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়। নবুয়ত তথা নবি-রাসুল আগমনের এ ক্রমধারাটির সমাপ্তিকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

যাঁর মাধ্যমে এ ক্রমধারা শেষ হয় তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়িন বা নবিগণের শেষজন। আর তিনি হলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)।

মর্ম

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি। তিনি হলেন খাতামুন নাবিয়িন। তাঁর পর আজ পর্যন্ত কোনো নবি আসেন নি আর কিয়ামত পর্যন্ত আসবেও না। তাঁর মাধ্যমে নবি-রাসূলের আগমনের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খতমে নবুয়তের ওপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না।

খতমে নবুয়তের প্রমাণ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ নবি। তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের ক্রমধারা *ChicZl* লাভ করেছে। কুরআন-হাদিসের বহু স্থানে এ বিষয়টি *‘U’* করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে আমরা খতমে নবুয়ত এর কিছু প্রমাণ *‘U’**fit*e জানব।

আল কুরআনের দলিল

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মহানবি (স.)-কে খাতামুন নাবিয়িন বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدًا إِبْرَاهِيمَ وَلِكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ

অর্থ : “মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি তো আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবি।”
(সুরা আল-আহ্যাব, আয়াত ৪০)

হাদিস শরিফের দলিল

বহু হাদিসে খতমে নবুয়তের প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে আমরা এ *‘U’**fit*K ক্রিতিপয় হাদিস জানবো-

১. মহানবি (স.) বলেন-*أَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ لَا يَتَّبِعُ بَعْدِي*

অর্থ: “আমিই শেষ নবি। আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।” (সহিহ মুসলিম)

২. রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- “রিসালাত ও নবুয়তের ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো নবি ও রাসূল আসবেন না।” (জামি তিরমিয়ি)
৩. নবি কারিম (স.) বলেন- “বনি ইসরাইলে নবিগণই নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোনো নবি ইস্তিকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবি আসবেন না।” (সহিহ বুখারি)
৪. একটি হাদিসে মহানবি (স.) উপমার মাধ্যমে খতমে নবুয়ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, “আমি ও আমার *‘ChicZl* নবিগণের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, এক লোক একটি দালান নির্মাণ করল। খুব সুন্দর ও লোভনীয় করে তা সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান ফাঁকা ছিল। লোকজন

দালানটির চারদিকে ঘুরে এর সৌন্দর্য দেখছিল আর বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল- “এ কোণে
একটি ইট রাখা হয় নি কেন? e-[।] আমিই সে ইট এবং আমি শেষ নবি।” (সহিহ বুখারি)

পুরো দালানে একটি ইট লাগানো বাকি ছিল। ইট লাগাতেই সে দালান Cⁱ C^f হয়ে গেল। নবুয়তও তেমনি
একটি দালানের সদৃশ। সেই দালানের সর্বশেষ ইট মহানবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁর মাধ্যমেই দালানের
সর্বশেষ ইট লাগানো হয়। Cⁱ C^f হয়ে গেল নির্মাণকাজ। ফলে নতুন করে দালানের আর কোথাও ইট
লাগানোর প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ নবি আসারও দরকার পড়বে না।

যৌক্তিক প্রমাণ

যুক্তির মাধ্যমেও আমরা খ্তমে নবুয়তের প্রমাণ লাভ করতে পারি। যেমন- যুক্তির আলোকে দেখা যায় এক
নবির পর অন্য নবি সাধারণত তিনটি কারণে এসে থাকেন। যথা-

- ক. C^e Zⁱ নবির শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে।
- খ. C^e Zⁱ নবির শিক্ষা A^m p^u হয়ে পড়লে কিংবা তাতে bZb K^Q সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন হলে।
- গ. C^e Zⁱ নবির শিক্ষা কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য নির্দিষ্ট হলে।

উপরিউক্ত কারণগুলোর কোনোটিই বর্তমানকালে প্রযোজ্য নয়। কেননা-

১. হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এটি বিন্দুমাত্র বিলুপ্ত বা বিকৃত হয় নি।
সুতরাং bZb কানো নবি আসার কোনো প্রয়োজন নেই।
২. রাসূল (স.)-এর শিক্ষা ও দীন ইসলাম Cⁱ C^f ও C^f ½। এতে কোনো A^m p^u নেই। এতে কোনোরূপ
সংযোজন ও বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলাই বলেছেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে Cⁱ C^f করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে
A^m p^u করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সুরা মায়িদা, আয়াত ৩)

৩. নবি কারিম (স.) কোনো বিশেষ স্থান বা কালের জন্য আসেন নি। বরং তিনি সর্বকালের সকলের নবি।
কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানের মানুষের নবি। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلّهِ أَسْبَحْرَأَوْنَزِيرَأ

অর্থ: “আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।”
(সুরা সাবা, আয়াত ২৮)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ : “বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।” (সুরা আরাফ, আয়াত ১৫৮)

নবি আগমনের তিনটি কারণের একটিও বর্তমানে প্রয়োজ্য নয়। সুতরাং নতুন কোনো নবি আগমনেরও প্রয়োজন নেই। আমাদের নবিই শেষ নবি। তিনিই খাতামুন নাবিয়িন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা খতমে নবুয়ত পাঠটি নীরবে পড়বে। শ্রেণির সকলে মিলে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। এবার তিনজনের একজন খতমে নবুয়তের ওপর কুরআনের দলিল, আরেকজন হাদিস শরিফের দলিল এবং অন্যজন যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখবে। তাদের বক্তব্য শ্রেণির সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। শিক্ষক মহোদয় সভাপতি ও সমন্বয়ক হিসেবে এ কাজে সহযোগিতা করবেন। সকলে অনুষ্ঠান শেষে বক্তাদের ধন্যবাদ জানাবে।

পাঠ ৬

আখিরাত

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। বাংলা ভাষায় একে পরকাল বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের যে নতুন জীবন শুরু হয় তা-ই পরকাল বা আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এটি অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবন।

আখিরাত বা পরকালের দুটি পর্যায় রয়েছে। যথা-

ক. বারযাখ

খ. কিয়ামত।

বারযাখ

দুটি e-'। মধ্যবর্তী পর্যায়কে বারযাখ বলে। মানুষের মৃত্যু থেকে কিয়ামত বা পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কে বারযাখ বলে। এটি কিয়ামত ও দুনিয়ার জীবনের মধ্যবর্তী পর্দা স্বরূপ। মানুষের মৃত্যুর পর এ জীবনের শুরু হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرَزَ خَالِيٌّ يَوْمٌ يُبَعْثُونَ

অর্থ : “আর তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ যা পুনরুত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।” (সুরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০০)

বারযাখ হলো কবরের জীবন। এটি আখিরাতের সর্বপ্রথম পর্যায়। বারযাখ জীবনে মানুষ দুনিয়ার ভালো আমলের কারণে শান্তি ভোগ করবে আর খারাপ আমলের জন্য KAWÍ ভোগ করবে।

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ দড়ায়মান হওয়া, ওঠা। ইসলামি পরিভাষায় কবর থেকে মানুষ উঠে সেদিন আল্লাহর সামনে দড়ায়মান হবে, তাই একে বলা হয় কিয়ামত। কিয়ামতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এরপর নেককারদের জাহানাতে এবং পাপীদের জাহানামে প্রবেশ করানো হবে।

গুরুত্ব

আখিরাত আকাইদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণবিষয়। আখিরাতের প্রতি ইমান আনা অপরিহার্য। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। মুমিনদের ॥ঘৃতকাল্পনা আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ ۖ

অর্থ : “আর তারা (মুক্তিকিগণ) আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মশীল করে তোলে। এর ফলে মানুষ উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার গুণাবলি অনুশীলন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأُخْرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝

অর্থ : “আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।” (সুরা নাহল, আয়াত ২২)

আখিরাতে বিশ্বাস না করলে মানুষ দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে। ফলে যেকোনো উপায়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করতে চায়। অন্যায়, অত্যাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ সবকিছুই তার দ্বারা সংঘটিত হয়। যেকোনো পাপ করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এরূপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং পবিত্র করে তোলে।

সুতরাং আমরা আখিরাতে বিশ্বাস করব এবং নৈতিক, পুত-পবিত্র জীবনযাপন করব।

কাজ : এই পাঠ শেষে আখিরাত ॥ঘৃতকাল্পনা শিক্ষার্থী যা শিখল তা লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

শাফাআত

শাফাআত শব্দের অর্থ সুপারিশ করা, অনুরোধ করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় কল্যাণ ও ক্ষমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট নবি-রাসূল ও নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে। কিয়ামতের দিন শাফাআত সাধারণত দুটি কারণে করা হবে। যথা-

- ক. পাপীদের ক্ষমা ও পাপ মার্জনার জন্য।
- খ. পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভের জন্য।

তাৎপর্য

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন। তারপর আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করবেন। এ সময় CylbMY জান্নাত লাভ ও পাপীরা জাহান্নাম ভোগ

করবে। নবি-রাসুল ও ﷺ বান্দাগণ এ সময় আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন। ফলে অনেক পাপীকে মাফ করা হবে। এরপর তাদেরকে জাহানাম থেকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

আবার অনেক পুণ্যবানের জন্যও এদিন শাফাআত করা হবে। ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

শাফাআতে সাধারণত দুই প্রকার। যথা-

ক. শাফাআতে কুবরা

খ. শাফাআতে সুগরা

শাফাআতে কুবরা

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে এক বিশাল ময়দানে সমবেত করা হবে। সেদিন Al-Khu'b নিকটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে নিপত্তি থাকবে। এ সময় তারা হ্যরত আদম (আ.), হ্যরত Ibn (আ.), হ্যরত ইবরাহিম (আ.), হ্যরত মুসা (আ.) ও হ্যরত ইসা (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট শাফাআত করতে অনুরোধ করবে। তাঁরা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করবেন। এ সময় সকল মানুষ মহানবি (স.)-এর নিকট উপস্থিত হবে। তখন মহানবি (স.) আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন। এ শাফাআতকে বলা হয় শাফাআতে কুবরা। একে শাফাআতে উষ্মাও (সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআত) বলা হয়।

এরূপ শাফাআতের অধিকার একমাত্র মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর থাকবে। এ ছাড়া নবি কারিম (স.)-এর জন্য দু'প্রকার শাফাআত নির্দিষ্ট। আর তা হলো জান্নাতিগণকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করা। প্রিয়নবি (স.) এরূপ শাফাআত করবেন। এর পরই কেবল জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

শাফাআতে সুগরা

কিয়ামতের দিন পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফাআত করা হবে। এটাই হলো শাফাআতে সুগরা। নবি-রাসুল, ফেরেশতা, শহিদ, আলিম, হাফিয এ শাফাআতের সুযোগ পাবেন। আল কুরআন ও সিয়াম (রোয়া) কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে বলেও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে শাফাআতে সুগরা করা হবে।

১. যাদের ওপর জাহানাম অবধারিত তাদের মাফ করে জান্নাতে দেয়ার জন্য শাফাআত।
২. যেসব মুমিন পাপের কারণে জাহানামে প্রবেশ করবে তাদের জাহানামের Khalq থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য শাফাআত।
৩. জান্নাতিগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য শাফাআত।

আমরা শাফাআতে বিশ্বাস স্থাপন করব। আল্লাহকে ভালোবাসব, রাসুলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ অনুযায়ী চলব। ফলে পরকালে প্রিয়নবি (স.)-এর শাফাআত লাভ করে জান্নাতে যাব।

কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও নেক বান্দাগণ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাআলা এসব শাফাআত করুল করবেন এবং বহু মানুষকে জান্নাত দান করবেন। তবে শাফাআতের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকবে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর অধিকারে। তিনি নিজেই বলেছেন-

أُطْيِّبُ الشَّفَاعَةَ

অর্থ : “আমাকে শাফাআত (করার অধিকার) দেওয়া হয়েছে।” (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন- পৃথিবীতে কত ইট ও পাথর আছে, আমি তার চেয়েও বেশি লোকের জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত করব। (মুসনাদ আহমদ)

শাফাআত একটি বিরাট নিয়ামত। মহানবি (স.)-এর শাফাআত ব্যতীত কিয়ামতের দিন সফলতা, কল্যাণ ও জান্নাত লাভ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমরা প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর শাফাআতে বিশ্বাস করব। তাকে ভালোবাস ও CFFC অনুসরণ করব। তাহলে আমরা তাঁর শাফাআত লাভে ধন্য হব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হবে। এবার একদল শাফাআতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলবে এবং অন্যদল প্রকারভেদ বর্ণনা করবে।

পাঠ ৮

জান্নাত

জান্নাত শব্দের অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফারসি ভাষায় একে বলা হয় বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ইমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চিরশাস্ত্রির আবাসস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে তাকে জান্নাত বলা হয়।

জান্নাত হলো চিরশাস্ত্রির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় e-' দ্বারা সুসজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্রসহ সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর নহর। মিষ্টিপানির স্নোত্থারা। e-' Z আনন্দ উপভোগের সব রকমের জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَكُمْ فِيهَا مَا لَشَتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

অর্থ : “সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।” (সুরা ফুস্সিলাত, আয়াত ৩১)

জান্নাতের বিবরণ দিয়ে রাসুল (স.) বলেন- “আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আমি আমার Cyleb বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব e-' তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ কোনোদিন দেখে নি, কোনো কান কোনোদিন শোনে নি, আর মানুষের অস্তরও যা কোনোদিন কল্পনা করতে পারে নি।’” (মিশকাত)

জান্নাতের নাম

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো-

১. Ribaṭij ফিরদাউস
২. Ribaṭij মাওয়া
৩. দারুল মাকাম
৪. দারুল কারার
৫. দারুন নাইম
৬. দারুল খুলদ
৭. দারুস সালাম
৮. Ribaṭijআদন।

এ আটটি জান্নাতের মধ্যে Ribaṭij ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

জান্নাত লাভের আমল ও উপায়

জান্নাত হলো মুমিনদের ও পুণ্যবানদের বাসস্থান। আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থ : “(হে নবি!) যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশ দিয়ে Syāfiqah প্রবাহিত।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫)

সুতরাং জান্নাত লাভের জন্য দুনিয়াতে সর্বপ্রথম ইমান আনতে হবে। আকাইদের সব বিষয়ের ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অতঃপর নেক কাজ করতে হবে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। মহানবি (স.) বলেছেন-

الصَّلَاةُ مُفْتَاحُ الْجَنَّةِ

অর্থ : সালাত হলো বেহেশতের চাবি।

নামাযের পাশাপাশি রম্যানের রোয়া পালন, যাকাত আদায় ও হজ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য সৎকাজ, উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুশীলন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আদেশ-নিয়ে মেনে চলতে হবে। সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَمَنْهِي النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى

অর্থ : “আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দড়ায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে, নিঃসন্দেহে জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।” (সুরা আন নাফিআত, আয়াত ৪০-৪১)

সুতরাং আমরা সব সময় নেক আমল করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ অমান্য করব না। তাহলেই আমরা আখিরাতে জান্নাত লাভ করতে পারব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

- ক. জান্নাতের নামগুলো লিখে একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।
- খ. জান্নাত লাভের উপায় amal ৫টি বাক্য খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯

জাহানাম

জাহানাম হলো আগন্তের গর্ত, $KW-1$ স্থান। একে দোষখ বা নরকও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় আখিরাতে কফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের $KW-1$ জন্য যে স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে তাকে জাহানাম বলা হয়।

জাহানাম খুবই ভয়ংকর স্থান। সেখানে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক $KW-1$ । সেখানে পাপীরা আগন্তে দগ্ধ হবে। বড় বড় সাপ, $18^{\circ}0$, কৌটপতঙ্গ মানুষকে দংশন করবে। জাহানামের আগন হবে আমাদের দুনিয়ার আগন থেকে স্বত্ত্ব গুণ বেশি উত্তপ্ত। জাহানামিদের খাদ্য হবে যাকুম নামক বড় বড় কঁটাযুক্ত বৃক্ষ। যা তারা খেতে পারবে না, বরং গলায় আটকে যাবে। তাদের পানীয় হবে দোষখিদের উত্তপ্ত রক্ত ও পুঁজ। সেখানে মানুষের কোনো মৃত্যু হবে না, বরং $KW-1$ পেতে থাকবে এবং চিরকাল ধরে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। জাহানামের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِنَا سُوفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
لِيَنْدُو قُوَّا عَذَابًا ۖ

অর্থ : “যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে অচিরেই আমি তাদেরকে (জাহানামের) আগন্তে প্রবেশ করাব। সেখানে যখনই তাদের চামড়া জলে যাবে তখনই bZb চামড়া সৃষ্টি করব যাতে তারা $KW-1$ ভোগ করতে পারে।” (সুরা আন নিসা, আয়াত ৫৬)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَارِطٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ أَخْبِيْمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي
بُطُونِهِمْ وَأَجْلُودُ ۝ وَلَهُمْ مَقَامُعْ مِنْ حَدِيبَيْنِ ۝ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَجْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ اعْيُدُوا فِيهَا
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

অর্থ : “যারা কুফুরি করে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ট পানি। এর দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। যখনই তারা যত্নগায় কাতর হয়ে জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদের পুনরায় তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের বলা হবে- স্বাদ গ্রহণ কর দহন-যত্নগার।” (সুরা আল হাজ্জ, আয়াত ১৯-২২)

জাহানামের নাম

জাহানাম মোট সাতটি। এগুলো হলো-

১. জাহানাম
২. হাবিয়া
৩. জাহিম
৪. সাকার
৫. সাইর
৬. হুতামাহ
৭. লায়া।

জাহানাম থেকে পরিত্রাণের উপায়

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের প্রতি যারা ইমান আনে না তারাই জাহানামের অধিবাসী। তাছাড়া যেসব লোক দুনিয়ায় অন্যায় ও পাপ কাজ করবে তারাও জাহানামের **Ku'ur** ভোগ করবে। অশুলি ও অনৈতিক কাজ করলেও জাহানামের **Ku'ur** ভোগ করতে হবে। সুতরাং আমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করব। তাহলে জাহানামের কঠিন **Ku'ur** থেকে রেহাই পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা-

- ক. জাহানামের নামগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
- খ. জাহানামের পরিচয় এবং জাহানাম থেকে পরিত্রাণের উপায় **মিল্ক** ১০টি বাক্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ইমান ও নৈতিকতা

ইমান হলো বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইমান বলা হয়। যে ব্যক্তি ইমান আনে তাকে বলা হয় মুমিন। আর নৈতিকতা হলো নীতিসম্বন্ধীয়, নীতিমূলক। কাজে-কর্মে, কথাবার্তায় নীতি ও আদর্শের অনুসরণই হলো নৈতিকতা।

ইমান ও নৈতিকতার *মাঝে* অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নৈতিকতার অনুসরণ করা মুমিন ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব। নীতি-নৈতিকতা না মানলে কোনো ব্যক্তি *মাঝে* মুমিন হতে পারে না। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ক্ষমা, *চিরুণি* সহযোগিতা, সাম্য-মৈত্রী, আত্ম ইত্যাদি সৎগুণ ইমানদার ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। এগুলো নৈতিকতার প্রধান *ক্ষমতা*। মুমিন ব্যক্তি এসব গুণ চর্চা করে থাকেন। অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি অনেক কাজ থেকে মুমিন ব্যক্তি *বাদে* থাকেন। ইমানের শিক্ষা মুমিনকে এসব কাজ থেকে ফেজাজত করে। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

মানুষ যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

অতএব বোঝা গেল মুমিন ব্যক্তি কোনোরূপ অনেক কাজ করতে পারে না।

ইমানের *gj K_|| ntj || - لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ* (লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ)

অর্থ : “আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাঝে নেই। মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল।”

এ কালিমার সারকথা হলো ইবাদত ও প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহ তাআলা ও রাসুল (স.)-এর দেখানো পথ ও আদর্শই হলো প্রকৃত মুক্তি ও সফলতার পথ। দুনিয়ার সর্বাবস্থায় সকল কাজে এ কালিমা মনে রাখতে হবে। এ কালিমার শিক্ষা নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে হবে। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা এরূপই করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের আদর্শই হলো নৈতিকতার আদর্শ। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা নীতি ও আদর্শ অনুসরণের জন্য বহু নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর রাসুল (স.) নিজে ছিলেন উত্তম আদর্শের *ইবে* নমুনা। তিনি হাতেকলমে মানুষকে নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিন ব্যক্তি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইমানের এ শিক্ষা *ইবে* করে থাকেন।

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, ইমান ও নৈতিকতা খুবই গভীরভাবে *মাঝে*। ইমান মানুষকে নীতি নৈতিকতার পথ দেখায়। ইমান অনেক ও অশ্লীল কার্যাবলি থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আমাদেরও উচিত ইমানের শিক্ষা প্রহণ করা। অতঃপর নিজ জীবনে তার *ইবে* করা। তাহলে আমরা নৈতিকতার অনুসারী হয়ে সমাজে শান্তি-*k;lj*। প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ফলে আমাদের দুনিয়ার জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। আর পরকালীন জীবনে আমরা লাভ করব মুক্তি, সফলতা ও চিরশান্তির জন্মাত।

কাজ : শেণির সব শিক্ষার্থী দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে। এবার প্রত্যেক দল থেকে তিনজন বক্তা নির্বাচন করবে। “প্রকৃত ইমানই কেবল মানুষকে নীতি-নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে” বিষয়ের পক্ষে একদল এবং বিপক্ষে একদল অবস্থান নিয়ে বিতর্ক করবে। শেণিশিক্ষক *mÂjij K* হিসেবে থাকবেন।

বিতর্ক শেষে বিজয়ী দলকে এবং উভয় দলের মধ্যে যে বক্তা বিতর্কে *hijâz*ভালো বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তাকে সবাই মিলে ধন্যবাদ জানাবে। সম্ভব হলে পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে।

অনুশীলনমুক্ত প্রশ্ন

ক্ষেত্র কর্তৃত প্রশ্ন

১. ইসলামের *gj* বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসকেই —— বলা হয়।
২. ইমানের —— দিক রয়েছে।
৩. আসমানি কিতাব সর্বমোট —— খানা।
৪. আল্লাহ মুহাইমিনুন অর্থ ——।
৫. শাফাত সাধারণত —— প্রকার।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শাফাত একটি	পরকাল
২. ইমান আল্লাহর একটি	বড় নিয়ামত
৩. মুনাফিকরা নিচয়ই	বিরাট নিয়ামত
৪. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা	অপরিসীম
৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলে	মিথ্যবাদী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আসমানি *WZiemgfln* বিশ্বাসের প্রয়োজন কেন?
২. নিফাক বলতে কী বুঝা?
৩. শাফাত বলতে কী বুঝায়?

eYBvgj K c̄k̄e

১. ইমানের গুরুত্ব ও তৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
২. রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. নেতৃত্ব চারিত্ব গঠনে ইমানের f̄igKv বিশ্লেষণ কর।

eūmbePib c̄k̄e

1 | Bgvtb tgšij K weIq KqWU?

- | | |
|-----------|-----------|
| K. wZbiU | L. ciPiuU |
| M. miZiuU | N. AvuiU |

2 | wbditKi dtj mgvtR m̄iO nq N

- i. অশান্তি
- ii. SMov weev`
- iii. g%ZK"

tKvbiU mWV?

- | | |
|-------------|----------------|
| K. i ও ii | L. i ও iii |
| M. ii ও iii | N. i, ii ই iii |

wbPi Abjt"Q`WU co Ges 3 | 4 b̄s^i c̄k̄e D̄Ei `vI

সাকিব ও সানিদ একই অফিসে চাকরি করে। সাকিব যথাসময়ে অফিসে আসে এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। সানিদ সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অজুহাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর অফিসে আসে এবং কাজেকর্মে ফাঁকি দেয়।

৩। সাকিবের একনিষ্ঠতার পেছনে কোন বিশ্লাসটি কাজ করছে?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. তাকদির | খ. আখিরাত |
| গ. হাশের | ঘ. মিষান। |

4 | mwbt` i Kvhtgi dtj tm ciTe N

- i. kw̄Í
- ii. wZi^-<vi
- iii. wb`v

tKvbiU mWV?

- | | |
|-------------|----------------|
| K. i ও ii | L. i ও iii |
| M. ii ও iii | N. i, ii ই iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। সুমাইয়া ও সামিয়া দুই বান্ধবী। নুহাশপল্লীতে বেড়াতে যাবে বলে দুজনেই দিন-তারিখ ঠিক করে। সুমাইয়া নির্দিষ্ট তারিখে Cj' Z নিয়ে সামিয়ার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু সামিয়া তার বাবার কাছ থেকে টিফিন, কাগজ ও কলমের অজুহাত দিয়ে বেশ কিছু টাকা নিয়ে আদিবার সাথে মার্কেটে ঘুরতে চলে যায়। পরদিন সামিয়ার সাথে সুমাইয়ার দেখা হয়। সুমাইয়া বিষয়টি উত্থাপন করলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং উভয়ই মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

- ক. মুনাফিকের চিহ্ন কয়টি?
- খ. তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বুঝায়?
- গ. সামিয়ার আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সুমাইয়ার কার্যক্রমের ফলাফল CJ' Cj' K আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। মনসুর সাহেব ও ইকবাল সাহেব একই অফিসে চাকরি করেন। ইকবাল সাহেব একজন ধর্মপ্রায়ণ ব্যক্তি। অফিসের সবার সাথেই তিনি ভদ্রভাবে কথা বলেন। একদিন মনসুর সাহেব তার অধীনস্থ কর্মচারী রাশেদকে এক গ্লাস পানি ও ফাইল আনতে বলেন। রাশেদ আসতে দেরি করায় মনসুর সাহেব তার সাথে অশ্রীল ভাষা ব্যবহার করেন। বিষয়টি অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানতে পেরে বলেন, ‘মুমিন ব্যক্তির আচরণ এরূপ হতে পারে না।’

- ক. জান্মাতের । কয়টি?
- খ. জাহানামের kW-। ধরন কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. মনসুর সাহেবের আচরণটি কিসের পরিপন্থী? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উক্তিটি কি যথার্থ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করে জীবন পরিচালনাকে ইসলামি পরিভাষায় ইবাদত বলে। ইসলাম হলো Cii C⁷জীবন বিধান। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয় যথা : কালিমা, নামায, রোয়া, যাকাত ও হজ যথাযথ পালনের নাম ইবাদত। আবার মানব জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান অনুযায়ী m^ubক্রেরাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সকল m^oe' মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- যাকাতের ধারণা, যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত ও ব্যয়ের খাত বর্ণনা করতে পারবে।
- যাকাতের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- হজের ধারণা, CUF^g, নিয়মাবলি, ফরয, ওয়াজিব ও m^ol^zm^g বর্ণনা করতে পারবে।
- হজ পালনের ত্রুটি এবং তা সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- সাম্য ও বিশৃঙ্খাত্ত প্রতিষ্ঠায় হজের f^gK^v ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কুরবানির ধারণা, CUF^g ও নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
- আকিকার ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- ev-Íe জীবনে ত্যাগ ও উদারতা অর্জনে কুরবানির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

পাঠ ১

যাকাত (الْكُرْتَافُ)

‘যাকাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পরিত্রাতা, Cii "Ob^z। ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ m^u থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব অভিবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে।

‘যাকাত’ প্রদানের মাধ্যমে m^u ব্যক্তিবিশেষের হাতে CÄfZ থাকে না। আর মানুষের হাতে m^u CÄfZ থাকুক আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। তিনি চান এটি মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। এ বিবেচনায় যাকাত অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত প্রদানে দাতার অন্তর কৃপণতার কল্যাণ হতে পৰিত্র হয়। বিত্তশালীদের m^u দরিদ্রের অধিকার আছে। কাজেই গরিবের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দিলে অবশিষ্ট m^u ধনীদের জন্য পৰিত্র হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় যাকাত অর্থ পৰিত্রতা। যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন। ইসলামের পাঁচটি গুরুত্বC⁷ বুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম।

কুরআন মাজিদের বহু জায়গায় সালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكُوَةَ

অর্থ : “আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।” (mj । মুহ্যাম্মিল, আয়াত ২০)

যাকাত হলো দরিদ্রের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। ধনীদের দয়া বা অনুগ্রহ নয়। বরং এটি আদায় করা ধনীদের ওপর ফরয। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْبَحْرُومِ

অর্থ : “তাদের (ধনীদের) ধন-মাপ্ত অবশ্যই দরিদ্র ও ইমারতে প্রদান কর এবং অধিকার রয়েছে।” (আয় যারিয়াত, আয়াত ১৯)

শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নামায আদায় করলে, আদায়কারীর জন্য যেমন পুরস্কারের ঘোষণা আছে, তেমনি যাকাত (ফরয হলে) আদায়কারীর জন্যও সুসংবাদ রয়েছে। যেমন, যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং মাপ্ত আল্লাহ তাআলা বরকত দেন। যাকাত প্রদানকারীদের আখিরাতে অধিক পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। হাদিসে কুদসিতে আছে, “আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে বলেন, হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাক। আমি আমার অফুরন্ত ভাঙ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকব” (বুখারি ও মুসলিম)।

যাকাত আদায়কারীদের মাপ্ত আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْكُمْ لَئِنْ أَقْتَمْتُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الْزَّكُوَةَ

অর্থ : “এবং আল্লাহ বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি যদি তোমরা নামায কায়েম করতে থাক এবং যাকাত দিতে থাক।” (আল মাযিদা, আয়াত ১২)

যাকাত দানকারীর পুরস্কার ও কৃপণ ব্যক্তির দুঃসংবাদ মাপ্ত অন্য এক হাদিসে আছে, “দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে `feZl অপরদিকে কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে `fi। এবং জাহান্নামের নিকটে। একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবিদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়।” (তিরমিয়ি)

কেউ যদি মাপ্ত জমা করে রাখে দরিদ্র ও ইমারতে প্রাপ্ত যথাযথভাবে আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে কঠোর kawī ভোগ করতে হবে। এ মাপ্ত কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে: আর যারা সোনা বৃপ্ত জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কষ্টদায়ক kawī। সংবাদ দাও। সেদিন জাহান্নামের আগনে তা উত্পন্ন করা হবে এবং তা দিয়ে কপালে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে, সেদিন বলা হবে এ তো সে মাপ্ত, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। এখন সে ইমারত মাপ্ত। স্বাদ গ্রহণ কর। (আত্ তাওবা: ৩৪-৩৫)

যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যারা তা আদায় করে না এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান nū'Q, পার্থিব জীবনে তারা কৃপণ হিসেবে আখ্যায়িত হবে এবং পরকালে কঠিন kawī। সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন : “আর ধর্ষস ঐসব মুশ্রিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।” (হা-মীম আস্স সাজ্দা: ৬-৭)

ইসলামের প্রথম খলিফা হয়েরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করল। খলিফা তাদের ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সমতুল্য মনে করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, মহানবি (স.)-এর যুগে যারা যাকাত দিত, তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি ছাগলের *Al'Pi* দিতেও অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব। হয়েরত আবু বকর (রা.)-এর বক্তব্যের মৌলিকতার সাথে নিম্নবর্ণিত হাদিসের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। হাদিসে আছে, “আল্লাহর কসম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।” (বুখারি)

প্রত্যেক মুমিন বান্দার উচিত পরকালের কঠিন *KW-I* থেকে মুক্তি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় যথানিয়মে যাকাত আদায় করা। অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা। ইসলামি বিধানমতো যাকাত আদায় করে সমাজের অসহায় দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাত প্রদানের সুফল *Al-Khalq* আলোচনা করবে।

পাঠ ২

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত (شرائط فرضيّة الزكوة)

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত সাতটি। শর্তগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

- মুসলমান হওয়া :** যাকাত ফরয হওয়ার প্রথম শর্ত হলো মুসলমান হওয়া। অমুসলিমদের ওপর যাকাত ফরয নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার অতীত জীবনের যাকাত দিতে হবে না। যেদিন মুসলমান হবে সেদিন থেকে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।
- নিসাবের মালিক হওয়া :** যে পরিমাণ *Al-Amal*। মালিক হলে শরিয়তে যাকাত ফরয হয়, সে পরিমাণ *Al-Amal*। মালিক হওয়া।
- নিসাব পরিমাণ *Al-Amal* প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া :** যেসব দ্রব্যের ওপর মানুষের জীবনযাপন নির্ভর করে, সেসব জিনিসপত্রকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলে। যেমন : খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-Clothes, বসবাসের বাড়িঘর, পেশাজীবীর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। যানবাহনের নৌকা, সাইকেল, মোটর, পশু, কৃষিকাজের সরঞ্জাম, পড়ালেখার সরঞ্জাম এসবও প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর ওপর যাকাত ফরয হবে না।
- FYM-O না হওয়া :** FYM-O ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ *Al-Amal*। মালিক হলেও তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ সে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনেই ঝণ গ্রহণ করেছে। তবে ঝণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব পরিমাণ *Al-Amal* কারো হাতে থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।
- মাল এক বছরকাল স্থায়ী থাকা :** নিসাব পরিমাণ *Al-Amal* ব্যক্তির হাতে এক বছর কাল স্থায়ী না হলে, তার ওপর যাকাত ফরয হয় না। হাদিসে আছে, “ঐ *Al-Amal* যাকাত নেই যা *C* এক বছর মালিকানায় না থাকে। (ইবনে মাজাহ)

৬. *Ávbmṣúbহওয়া* : যাকাত ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত $n\ddot{t}'Q$ *Ávbmṣúbহওয়া*। জ্ঞানবুদ্ধিহীন তথা পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়।

৭. **বালেগ হওয়া** : যাকাতদাতাকে অবশ্যই বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। শিশু, নাবালেগ যত *mṣūf'*। মালিকই হোক না কেন, বালেগ হওয়ার $C\ddot{e}$ তার ওপর যাকাত ফরয হয় না।

যাকাতের নিসাব (*نِصَابُ الرِّزْقِ*)

‘নিসাব’ আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ। শরিয়তের পরিভাষায় যাকাত ফরয হওয়ার জন্য *mṣūf'*। নির্ধারিত পরিমাণকে নিসাব বলে। সারাবছর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর বছর শেষে যার হাতে নিসাব পরিমাণ *mṣūf'* উত্তুত থাকে তাকে বলা হয় সাহিবে নিসাবের মালিক। আর সাহিবে নিসাবের ওপরই যাকাত ফরয। নিসাবের পরিমাণ হলো, সোনা কমপক্ষে সাড়ে সাত তোলা অথবা বুপা কমপক্ষে সাড়ে বায়ন্ন তোলা অথবা $\dot{g}\ddot{j}j$ । অর্থ বা *mṣūf'*। ঐ পরিমাণ *mṣūf'* কারো নিকট $C\ddot{e}$ এক বছরকাল স্থায়ী থাকলে ঐ সোনা, বুপা বা *mṣūf'*। মূল্যের চলিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দেওয়া ফরয। কিন্তু সম্পদ নিসাবের কম থাকলে যাকাত দেওয়া ফরয নয়। এক বছর $C\ddot{e}$ হওয়ার আগেই *mṣūf'* নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না। কারো হাতে যদি বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ *mṣūf'* থাকে, বছরের মাঝে কোনো কারণে নিসাব হতে কমে যায় এবং বছর শেষে আবার নিসাব পরিমাণ *mṣūf'*। মালিক হয়ে গেলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

শ্রীলোকের ব্যবহার্য সোনা, বুপার অলংকার জীবনের আবশ্যিকীয় মৌলিক e^- । অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অলংকার নিসাব পরিমাণ হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। সোনা, বুপা ব্যতীত অন্য কোনো *qāzī* যথা: তামা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিস হিসাবে থাকলে যাকাত দিতে হবে না। তবে ব্যবসায়ের সামগ্ৰী হলে যাকাত দিতে হবে। এর জন্য শর্ত $n\ddot{t}'Q$ এসব সামগ্ৰী এক বছরকাল হাতে স্থায়ী থাকা এবং নিসাব পরিমাণ হওয়া।

উৎপন্ন শস্যের যাকাত

ধান, গম, ঘব, খেজুর ইত্যাদি শস্য বিনাসেচে বৃষ্টির পানিতে জন্মালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। একে উশর বলা হয়। আর সেচ ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাকাতের নিসাব *mṣūf'* আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

যাকাতের মাসারিফ (مَصَارِفُ الرِّزْكِ)

মাসারিফ আরবি শব্দ। এর অর্থ ব্যয় করার খাত। শরিয়তের পরিভাষায় ইসলামি বিধান অনুযায়ী যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, তাদেরকে বলা হয় যাকাতের মাসারিফ। যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ কোন কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে :

“যাকাত AfveMūrī, কেবল নিঃস্ব ও যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, যাদের চিন্তা আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তি, ঋণ ভারাক্রান্ত, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য, এটি আল্লাহর বিধান।”
(সুরা আত তাওবা, আয়াত ৬০)

যাকাতের মাসারিফ আটটি :

১. AfveMūrī বা ফকির।
২. সম্বলহীন, মিসকিন।
৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।
৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে।
৫. মুক্তিকামী দাস।
৬. FYMūrī ব্যক্তি।
৭. আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তি।
৮. মুসাফির বা অসহায় প্রবাসী পথিক।

নিচে মাসারিফের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. **AfveMūrī বা ফকির :** ফকিরকে বাংলায় গরিব বলা হয়। যাদের কিছু না কিছু মাঝু' আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। যাদের জীবনধারণের জন্য অপরের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হয়, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যায়। জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি, পঙ্গু, ইয়াতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল এবং যারা দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার শিকার এমন লোকদের সাময়িকভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যায়।
২. **মিসকিন :** যারা নিঃস্ব, নিজের পেটের অন্নও যোগাড় করতে পারে না এবং AfveMūrī থাকা সত্ত্বেও সম্মানের ভয়ে কারো Mī-' হয় না, তাদের মিসকিন বলে। মিসকিন Mā'ūfK হাদিসে আছে, “যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন মোতাবেক Mā'ūf' পায় না, অথচ Al-Zāmūfūbi ভয়ে সে এমনভাবে চলে যে, তাকে অভাবী বলে বোঝাও যায় না, যাতে লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। আর সে সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাতে না, কিছু চায়ও না।” (বুখারি ও মুসলিম)। মিসকিনকে যাকাত দেওয়া যায়।

৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ : যারা যাকাত আদায় করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, বণ্টন করে ও হিসাবপত্র রাখে, তাদের যাকাতের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী বলে। তারা আর্থিক $\text{ম}/\text{৳} \text{Zm}$ মাসিভলেও যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে।
৪. মন জয় করার উদ্দেশ্যে : সদ্য মুসলমান হওয়া ব্যক্তির সমস্যা 'Kif' এবং ইসলামের ওপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদের যাকাত দেওয়া যাবে। ইসলামি পরিভাষায় তাদের 'মুআল্লাফাতুলকুলুব' বলা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ জাতীয় লোককে যাকাত দেওয়ার বিধান ছিল।
৫. মুক্তিকামী দাস : যে দাস তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি পাওয়ার $\text{P}/\text{৳}^3$ করেছে এমন দাসকে মুক্তির gj " পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যেতে পারে। বর্তমানে ইসলামে ক্রীতদাস প্রথা চালু নেই বিধায় এ খাতে যাকাতের অর্থ বণ্টন করা হয় না।
৬. FYM' ব্যক্তি : যে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে ঝণ পরিশোধ করতে অক্ষম, তাদের যাকাত দিয়ে ঝণ পরিশোধ করতে সাহায্য করা যায়।
৭. আল্লাহর পথে : এর আরবি পরিভাষা হলো 'ফি সাবিলল্লাহ'। এটির অন্য অর্থ জিহাদ। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং কুফরি ব্যবস্থাকে Bgf করে ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলে। যে কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সংগ্রামই এক প্রকার জিহাদ। এরূপ ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাত থেকে সাহায্য করা যায়।
৮. অসহায় প্রবাসী পথিক : কোনো ব্যক্তি সফরে গিয়ে অসহায় অবস্থায় পড়লে বা যাত্রাপথে আর্থিক বিপদে পড়লে সাময়িকভাবে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের মাসারিফ'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকলে, সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হবে। আবার ধনীরাও তাদের দায়মুক্ত হওয়ার বিশেষ সুযোগ পাবে। কাজেই ইসলামে যাকাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। $\text{fbfgf} \text{KfZi}$ কতিপয় গুরুত্ব $\text{mfp} \text{K} \text{cYf}$ করা হলো :

১. যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যাকাতের অন্যতম গুরুত্ব হলো অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা। সমাজের কেউ mfp । পাহাড় গড়বে, mfp ইমারতে বসবাস করবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করবে, আর কেউ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাবে এমন বিধান ইসলামে নেই। কেউ শিক্ষা, খাদ্য, e^- , বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা CIV করতে পারবে না, আর

বাড়ি বাড়ি ঘুরবে, শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করে না। কাজেই সকল শ্রেণির নাগরিকের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ইসলাম ধনীদের ওপর যাকাত ফরয করেছে। রাসুলগ্লাহ (স.) বলেন, “আল্লাহ তাআলা লোকের ওপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। তা নেওয়া হবে ধনীদের থেকে এবং বিলিয়ে দেওয়া হবে দুস্থদের মধ্যে।” (বুখারি ও মুসলিম)

সাধারণত মানুষের অর্থের প্রতি লিঙ্গ থাকে। যে কৃপণ স্বভাবের হয়, সে নিজের কফ্টে উপার্জিত অর্থ নিঃস্বার্থভাবে কাউকে দিতে চায় না। তাই দয়াময় আল্লাহ তাআলা ॥ম্যাঁ kuj ॥ ব্যক্তিদের মনকে ॥ম্যাঁ ॥। লিঙ্গ, লোভ, কৃপণতা, স্বার্থপ্রতা প্রভৃতি দোষ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষের মনকে দয়াময়, স্নেহ, মমতা ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক ॥ম্যাঁ ॥করে তোলার জন্য তাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন।

॥ম্যাঁ ॥ প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। মানুষের নিকট তা আমানতস্বরূপ। মানুষ শ্রম ও মেধার দ্বারা ॥ম্যাঁ ॥ অর্জন করবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক ॥ম্যাঁ ॥ খরচ করবে। কিন্তু ॥ম্যাঁ ॥ জমা করে রাখা বা কেবল নিজের ভোগবিলাসের জন্য খরচ করা ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ ধনীদের ॥ম্যাঁ ॥ দরিদ্রের অধিকার আছে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। গরিবের অধিকার আদায় করলে মালিক দায়মুক্ত হবে, ॥ম্যাঁ ॥ পবিত্র হবে; অন্যথায় ॥ম্যাঁ ॥ হালাল হবে না। ইসলামি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ সমর্থন করা হয় না। যাকাত প্রথার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করা হতো। আদায়কৃত মালের বিতরণও সরকারি ব্যবস্থাপনায় হতো। নিসাবের নির্ধারিত পরিমাণ ॥ম্যাঁ ॥। মালিকরা যাকাত দিতে বাধ্য থাকত। অন্যদিকে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার (দাবিদার) তারা সবাই যাকাতের অর্থ পেয়ে উপকৃত হতো।

কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মোতাবেক যাকাত আদায় ও বিতরণ করা মুসলমানদের একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ ব্যবস্থাপনার ওপর মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। মুসলিম ॥ম্যাঁ ॥q ইসলামি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কমে আসবে; কেউ বেকার থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে। অসহায় গরিব মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা একটি মানবিক দায়িত্ব। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে এ মানবিক গুণের বিকাশ ঘটবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে ‘যাকাতের অর্থনৈতিক’ গুরুত্বের ওপর আলোচনা করবে।

২. যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈশম্য ॥+ হয়। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্র Cj' Z হয়। আল্লাহর নির্দেশমতো যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করলে সমাজের কোনো লোক অনুহীন, e-এন্সিব, গৃহহীন থাকবে না। কেউ না খেয়ে থাকবে না। কেউ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না।

॥ম্যাঁ kuj ॥ ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও সাদাকার (দানের) অর্থে অভাবীদের প্রয়োজন মিটিয়েও অনেক জনহিতকর এবং Kj "Wgj K কাজ করা যায়। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। স্বাস্থ্যবান দরিদ্র শ্রমিককে তার শ্রমের উপযোগী উপকরণ দেওয়া সম্ভব হয়। দরিদ্রের জন্য †meigj K

অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ইয়াতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রত্নতি স্থাপন করা যায়। এমনিভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে এমন এক সময় আসবে যখন যাকাত গ্রহণ করার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামের প্রথম যুগে এমনি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ACE^{ওফাল্য} অর্জিত হয়েছিল। 'রাষ্ট্রস্বরূপ খলিফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রা.)-এর যুগের কথা উল্লেখ করা যায়। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে, তাঁর যুগে যাকাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা গোটা সমাজকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্যে প্রভৃতি বদভাস থেকে পবিত্র রাখে এবং CI-ংটি। মধ্যে ভালোবাসা, ত্যাগ, মমত্ববোধ ইত্যাদি গুণ আরও সুদৃঢ় করে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'যাকাতের সামাজিক গুরুত্বের' ওপর আলোচনা করবে।

পাঠ ৫

হজ (জ্ঞান)

'হজ' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, B"QI করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় নির্দিষ্ট 'hajj' নির্ধারিত পদ্ধতিতে আল্লাহর নেকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট 'ibadah বিশেষ কার্যাদি *মাফ* b করাকে হজ বলে। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত মক্কা, মিনা, আরাফা এবং মুয়দালিফায় আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন কার্য *মাফ* b করাও হজের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নরনারীর ওপর জীবনে একবার হজ আদায় করা ফরয। এরপর যতবার হজ করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবে। হজ *মাফ* K^{আল্লাহ} তাআলা বলেন :

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য।"

(সুরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

যেসব লোক কাবাঘর পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ হতে ফিরে আসা অবধি পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম, তাদের ওপর হজ ফরয। মহিলা হাজি হলে একজন সজী থাকতে হবে। সজী হবেন স্বামী অথবা এমন আত্মীয় যার সাথে বিবাহ *মাফ* K^{হারাম}। যেমন: বাবা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি। সফরসজীর ব্যয়ভার মহিলা হাজিকেই বহন করতে হবে।

হজের ঐতিহাসিক পটভূমি

ইসলামের পাঁচটি *ইমার* মধ্যে সালাত অন্যতম। সালাত আদায় ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীতে যে ঘর (ইবাদতখানা) তৈরি হয়, তার নাম 'বাইতুল্লাহ' বা আল্লাহর ঘর। কালক্রমে এ পবিত্র ঘর জনমানবক্বি হয়ে পড়ে।

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাকে জন্ম নেওয়া আল্লাহর নবি হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশে বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কাবাঘরের নিকটবর্তী জনমানবKB” স্থানে রেখে যান। বিবি হাজেরা স্বামীকে লক্ষ করে বললেন : “আমাদের এমন মরু প্রান্তরে ফেলে রেখে কেন চলে যান?” উত্তরে স্বামী বললেন, “আল্লাহর নির্দেশ।” বিবি হাজেরা বললেন, “তাহলে আল্লাহর B”QIB C% হোক। তিনি অবশ্যই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবেন।” যাওয়ার সময় হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁদের জন্য দোয়া করলেন।

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব Zig KQI লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল ফলাদি দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও যেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (mj। ইব্রাহিম, আয়াত ৩৭)

নবি ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রার্থনা আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন।

হ্যরত ইব্রাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া সামান্য খাদ্য ও পানীয় কয়েক দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। মা ও শিশু পুত্র ক্ষুধা পিপাসায় কাতর। মা হাজেরা নিকটস্থ সাফা পাহাড়ে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, আবার মারওয়া পাহাড়ের Potaq উঠে চারিদিকে তাকান, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা যায় কি না, যাতে তাদের নিকট থেকে সামান্য পানি নিয়ে পিপাসা কাতর পুত্রের মুখে দেওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্নও দেখা গেল না। এমনিভাবে সাতবার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানৌড়ি করলেন। তারই নির্দশনস্বরূপ হাজিগণ ঐ স্থানে (সাঙ্গ) দ্রুত হাঁটেন। মা হাজেরা কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে শিশুর কাছে ফিরে এসে বিসয়ে দেখলেন, নিকটেই মাটি ফুঁড়ে স্ব”Q পানির ফোয়ারা বইছে। এ পানির ফোয়ারাই ছিল বিখ্যাত যম্যম Kfci উৎস। বিবি হাজেরা শিশু ইসমাইলকে পানি পান করিয়ে তার ত্রুট্য নিবারণ করলেন। নিজেও ত্রুটিসহকারে পানি পান করে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। g|yf|g|Z যেখানে পানি থাকে সেখানে আকাশে পাথি ওড়ে। `+ হতে তা দেখে কাফেলা এসে জমা হয়। জুরহাম বংশের এক বাণিজ্য কাফেলা এসে মা হাজেরার অনুমতি নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করল। ক্রমে আরও লোকজন এসে জড়ো হলো। সকলের বিশ্বাস, এ পুণ্যাত্মা মা ও শিশুর কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা এ উষর মরুর বুক চিরে পানির ঝর্ণা বইয়েছেন। ধীরে ধীরে মক্কা একটি জনপদে পরিণত হলো।

হ্যরত ইসমাইল যখন কিশোর বয়সে উপনীত হলেন তখন ইব্রাহিম (আ) একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করার জন্য আল্লাহ তাঁকে আদেশ করলেন। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) আপন পুত্রকে কুরবানি করতে C|’ Z হয়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম (আ)-কে কাবাঘরের স্থানটি দেখিয়ে তা পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। ইব্রাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন। তারপর এ দোয়া করেন :

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

অর্থ : “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রেতা, সর্বজ্ঞানী।”
(mj। আল-বাকারা, আয়াত ১২৭)

এরপর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) মানুষকে হজের জন্য আহ্বান করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَأَنِّي فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ أَنُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَأْمِيرٍ يَتَبَيَّنُ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَيْقِيَّةٍ ۝

অর্থ : “আর আপনি সকল মানুষকে হজের জন্য ডাক দিন। তারা এ ডাকে সাড়া দিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে।” (mij ॥ আল হাজ্জ, আয়াত ২৭)

হ্যরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আহ্বানে কাবা শরিফ আবার তাওহিদের C^lifg‡Z পরিণত হলো। হ্যরত ইব্রাহিম (আ.) চলে গেলেন আপন কর্মক্ষেত্রে। আর হ্যরত ইসমাইল (আ.) রয়ে গেলেন মক্কায়। পরবর্তীকালে তিনিও নবি হলেন। মৃত্যুর সময় কাবার দায়িত্বভার অর্পণ করে গেলেন আপন বংশধরের ওপর। কালক্রমে তারা আল্লাহকে f‡j গিয়ে g‡Z‡R‡ শুরু করল। কাবাগৃহে তারা স্থাপন করল ৩৬০টি g‡Z‡ হজের সময় ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রথাগুলো পালিত হতো তবে তারা CR‡-অর্চনা করত প্রতিমার সামনে।

উত্তরাধিকার m‡I কুরাইশ বংশ তখনো কাবার রক্ষক এবং হজের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ফলে দেশ-বিদেশে ছিল তাদের যথেষ্ট সম্মান। এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)। বাল্যকাল থেকে তিনি g‡Z‡R‡K অপছন্দ করতেন। মক্কায় অতি অল্পসংখ্যক লোক তখনো g‡Z‡R‡K ঘৃণা করতেন। তাঁদের বলা হতো হানিফ বা একনিষ্ঠ। তাঁরা g‡Z‡R‡ না করে ইব্রাহিমি হজ পালন করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবি কারিম (স.) পুনরায় ইব্রাহিমি হজ চালু করেন।

KIR : শিক্ষার্থীরা হজের ঐতিহাসিক CUFig‡ ওপর দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

হজের তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি - ۱. মধ্যে হজ C^lAg। সারাবিশ্বের মুসলিম জাতির মহাসম্মেলন। বিশ্বের সকল মুসলিম যে এক উমত, হজ মৌসুমে মক্কায় এর ei-Íe প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানগণ আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নির্দিষ্ট দিনগুলোতে মক্কায় একত্র হয়। সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান পালন করে। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, Kg^lPI। এক। সকলের পরিধানে একই ধরনের সাদা পোশাক। ভাষা, বর্ণ, জীবন পদ্ধতির বিভিন্নতা সঙ্গেও তারা সকলে একই ধ্বনি D^lPij ‡Y একাকার হয়ে যায়। সকলের হৃদয়ে এক আল্লাহর নাম। এতে পৃথিবীর সব দেশের লোকের Ci-Ui মিলনের সুযোগ হয়। Ci-Í‡I। মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ হয়। এভাবে হজ সারাবিশ্বের মুসলমানকে সাম্য ও ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। প্রতি বছর হাজিদের হজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে মুসলিম জাহানের প্রত্যেক A^lAj মুসলমানের প্রাণে এক অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইসলামের C^lYPiA^lj পরিবেশ বজায় রাখার জন্য হজের যে এক বিরাট অবদান আছে এর মাধ্যমে তা ei-Í‡e প্রতিফলিত হয়।

হজের ফয়লত

ইসলামে প্রত্যেকটি ইবাদতেরই যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফয়লত রয়েছে। হজেরও অনেক গুরুত্ব ও ফয়লত রয়েছে। হজের গুরুত্ব মাধ্যমিক রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوِمِ وَلَدْتُهُ أَمْهَ-

অর্থ : “যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ যিয়ারতে এসে কোনো অশীল কাজ করল না, আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো কাজে লিপ্ত হলো না, সে গুনাহ বা পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে ফিরল যেমন সে পবিত্র ছিল সেদিন, যেদিন সে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল।” (বুখারি ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেন, “তোমরা হজ ও উমরাহ পর পর করতে থাক। কারণ এ দুইটি ইবাদত দারিদ্র্য, অভাব এবং গুনাহগুলোকে এমনভাবে `+ করে দেয় যেমন আগুনের ভাটি লোহা, সোনা ও টাঙ্কা ময়লা কাঞ্চি করে তা বিশুদ্ধ করে দেয়। হজে মাবুরুরের (মাকবুল) প্রতিদান ন্ত “Q একমাত্র জান্নাত” (নাসাই)। যে মুসলমানদের ওপর হজ ফরয তাদের উচিত খুশি মনে হজ পালন করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে হজের ফজিলত ও তৎপর্যের ওপর আলোচনা করবে।

পাঠ ৬

হজের ফরযস্তু (فَرَائضُ الحَجَّ)

হজের ফরয তিনটি

১. হজের নিয়তে ইহুরাম বাঁধা।
২. আরাফার ময়দানে নাই যিলহজ তারিখে অবস্থান (I Kd) করা।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত করা।

হজের ওয়াজিবসমূহ (وَاجِبَاتُ حِجْزٍ)

হজের ওয়াজিব কাজ পাঁচটি

১. আরাফার ময়দান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় মুয়দালিফায় অবস্থান করা।
২. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো বা সাঁজ করা।
৩. শয়তানকে (Rgj i Zj আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করা।
৪. তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ মক্কার বাইরে থেকে আগত হাজিদের জন্য বিদায়কালীন তাওয়াফ করা। একে তাওয়াফুল বিদা (বিদায়ী তাওয়াফও) বলে।
৫. মাথা মুড়ানো বা চুল ছাঁটা।

হজের সুন্নাতসমূহ (حُجُّ الْأَنْوَافُ)

হজের অনেক সুন্নাত রয়েছে। নিচে কয়েকটি সুন্নাত উল্লেখ করা হলো :

১. বহিরাগতদের জন্য তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা।
২. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
৩. যিলহজ মাসের ৭ তারিখে ইমামের মকায় হজ M'fūt K'খুতবা প্রদান করা। ৯ তারিখে আরাফায় দ্বিপ্রহরের পর খুতবা প্রদান করা। একাদশ তারিখে মিনায় খুতবা দেওয়া।
৪. ৮ই যিলহজে মক্কা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা, মিনায় উপস্থিত হয়ে যুহর থেকে ৯ই যিলহজে ফজর পর্যন্ত অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।
৫. ৯ই যিলহজে M'fūt পর মিনা থেকে আরাফার দিকে রওয়ানা করা।
৬. সম্ভব হলে আরাফাতে গোসল করা।
৭. ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা।
৮. মুয়দালিফায় রাত কাটানোর পর ফজরের নামায আদায় করে M'fūt দিয়ে C'e'minār দিকে রওয়ানা করা।
৯. যিলহজ মাসের ১১, ১২ তারিখে কংকর নিষ্কেপ (রামি) এর জন্য মিনাতে রাত্যাপন করা।
১০. যিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ক্রমধারা ঠিক রেখে কংকর নিষ্কেপ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হজের ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

হজ পালনের নিয়ম

ইসলামের প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় করতে হয়। হজ আদায়েরও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। M'fūt
হজ পালনের নিয়মাবলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

ইহুরাম : ইহুরাম আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষিদ্ধ। নামাযের উদ্দেশ্যে যেমন তাহরিমা বাঁধতে হয়, হজের জন্যও তেমনি ইহুরাম বাঁধতে হয়। এটি হজের আনুষ্ঠানিক নিয়ত। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ থেকে যিলহজ মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত যেকোনো দিন ইহুরাম বাঁধা যায়। এ সময় ছাড়া অন্য সময় ইহুরাম বাঁধলে হবে না। এ সময় ইহুরামের পোশাক পড়বে ও কিবলামুখী হয়ে সরবে তালবিয়া পাঠ করবে। হজ মৌসুম ছাড়া অন্য সময় যদি কেউ কাবাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের B"QI করে তবে তাকেও হজের ইহুরাম বাঁধার স্থানে (মিকাতে) পৌঁছে ইহুরাম বাঁধতে হবে।

তাওয়াফে কুদুম (আগমনি তাওয়াফ)

ইহুরাম বাঁধার পর মক্কা পৌছে কাবাঘরের চারধারে তাওয়াফ করতে হয়। অর্থাৎ সাতবার ঘূরতে হয়। মক্কা শরিফ পৌছার পর এটি প্রথম তাওয়াফ। এ কারণে একে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনি তাওয়াফ বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ শুরু করতে হয়।

সাঁই : আগমনি তাওয়াফ শেষ করে কাবাঘরের $\text{Ab}\|\text{Z}^{\text{f}}\text{fi}$ অবস্থিত সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝের পথটি সাতবার অতিক্রম করতে হয়। একে বলা হয় সাঁই। সাফা পাহাড় থেকে সাঁই শুরু করে মারওয়া পাহাড়ে শেষ করতে হয়।

তারপর ইহুরাম অবস্থায় ফিলহজ মাসের সাত তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এ সময়ের মধ্যে যতবার $\text{B}^{\text{f}}\text{QI}$ তাওয়াফ করা যায় এগুলো নফল তাওয়াফ। সাঁই করার প্রয়োজন নেই। নফল তাওয়াফে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

৭ই ফিলহজ

এ তারিখে যুহর নামায়ের পর ইমাম খুত্বা দেন। এ খুত্বায় তিনি হজ $\text{M}\|\text{H}\|\text{U}\text{K}\|\text{A}\text{f}\text{i}$ জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ করে ৮ তারিখ মিনায় এবং ৯ তারিখ আরাফাতে করণীয় বা আহ্কাম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেন।

৮ই ফিলহজ

এ তারিখে হাজিগণ $\text{M}\|\text{H}\|\text{U}\text{K}\|\text{I}\text{q}\text{i}$ পর মিনায় আসেন। সুন্নাত অনুযায়ী গোসল করেও ইহুরামের চাদর পরে ‘মসজিদুলহারাম’ বা বাইতুল্মাহ শরিফে আসেন। ইহুরাম ও নিয়তের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনায় যেতে হয়। সেখানে পরের দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নাত।

৯ই ফিলহজ

নবম তারিখ আরাফার দিবস। এদিন সকালেই ‘আরাফায় অবস্থানের’ উদ্দেশ্যে মিনায় ফজরের নামায আদায় করে আরাফার ময়দানের দিকে রওয়ানা করতে হয়। এখানে ইমামের পোছনে যুহরের ওয়াক্তে যুহর ও আসর উভয় নামায একসঙ্গে আদায় করতে হয়। নামাযের $\text{C}\|\text{E}\text{H}\|\text{I}\text{m}\text{a}\text{f}\text{f}$ খুত্বা দেন। খুত্বায় হজের বাকি বিধিবিধান বর্ণনা করেন। আরাফার ময়দানে অবস্থান হজের একটি ফরয কাজ। ৯ তারিখ অথবা অনিবার্য কারণে ৯ তারিখের রাত পরবর্তী সুবহি সাদিকের $\text{C}\|\text{E}\text{H}\|\text{I}\text{m}\text{a}\text{f}\text{f}$ -কোনো সময়ে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হয়। অন্যথায় হজ হবে না। এদিন $\text{M}\|\text{H}\|\text{U}\text{K}\|\text{I}\text{q}\text{i}$ । সাথে সাথে আরাফার মাঠ থেকে মিনার দিকে ফিরতে হয়। পরে মুয়দালিফা নামক স্থানে পৌছে ইশার নামাযের সময়ে মাগরিব ও ইশা এক সঙ্গে আদায় করতে হয়। এ রাত মুয়দালিফায় কাটাতে হয়।

১০ই ফিলহজ

দশম দিন কুরবানির দিন। এদিন সকালে $\text{M}\|\text{H}\|\text{U}\text{K}\|\text{I}\text{q}\text{i}$ $\text{C}\|\text{E}\text{H}\|\text{I}\text{m}\text{a}\text{f}\text{f}$ হাজিগণ মিনার পথে রওয়ানা হয়। মিনার এক স্থানে শয়তানের প্রতিকৃতি হিসেবে পরপর তিনটি পাকা $\text{R}\|\text{O}$ আছে। সেখানে পৌছে এদিন বড় শয়তানের প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। কংকরগুলো ছোলা পরিমাণ বড় হতে হয়। হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন আল্লাহর ইঙ্গিতে প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে $\text{h}\|\text{W}\|\text{Q}\|\text{f}\text{j}\text{b}$,

তখন শয়তান পিতা-পুত্রের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে তাঁদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাঁরা বিরক্ত হয়ে শয়তানের প্রতি পাথর নিষ্কেপ করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও নিষ্ঠার প্রতি সমান দেখিয়ে হাজিগণ এ পাথর নিষ্কেপ করে থাকেন।

কংকর নিষ্কেপের পর এ মিনাতেই কুরবানি করতে হয়। কুরবানির পর হাজিগণ মাথা কামিয়ে ইহুরাম থেকে মুক্ত হন। চুল ছোট করলেও চলে, তবে mg^{-1} মাথার চুল সম্পরিমাপে থাকতে হয়। মেয়েদেরকে চুলের অগ্রভাগের কিছুটা কাটলেই চলে। তারপর ঐ তারিখেই অথবা ১১ কিংবা ১২ তারিখে মক্কা ফিরে কাবাদুর তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এটি হজের একটি ফরয কাজ।

ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶେର ସମୟ ଯଦି ସାଫା ଓ ମାରଓୟାଯ ସାଙ୍ଗ ନା କରେ ଥାକେ ତବେ ଏ ତାଓୟାଫେର ପର ସାଙ୍ଗ କରାତେ ହୁଯ । ଆଗେ କରେ ଥାକଲେ ଆର ପ୍ରୋଜନ ହବେ ନା । ତାରପର ମିନାୟ ଫିରେ ଯେତେ ହୁଯ ଏବଂ ସେଖାନେଇ ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖ ଥାକତେ ହୁଯ ।

১১ ও ১২ তারিখ দুপুরের পর মিনার তিনটি - $\text{Í}_{\text{f}}\text{pm}$ প্রতিটিতে সাতটি করে কংকর মারতে হয়। তারপর $B\ddot{\text{f}}\text{Q}$ করলে ১২ তারিখেই মক্ষায় ফিরে আসতে পারেন। যদি কেউ মিনায় থেকে যান তবে তাঁকে ১৩ তারিখ দুপুরের পর তিনটি - $\text{Í}_{\text{f}}\text{pm}$ পেথর নিক্ষেপ করে মক্ষায় ফিরতে হয়। এভাবে হজের কার্যাবলি সমাপ্ত করতে হয়। যারা বহিরাগত তাদের সর্বশেষ কাজ $n\ddot{\text{f}}\text{Q}$ বিদায়ী তাওয়াফ করা। একে ‘তাওয়াফুল বিদা’ বা প্রত্যাবর্তনকালীন তাওয়াফও বলে। বহিরাগতদের জন্য এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

হজের ত্রুটি ও তা সংশোধনের উপায় :

হজ পালনকালে Amb'Qvq। অনেক TjU-বিচুতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এই ত্রুটির কোনোটি গুরুতর আবার কোনোটি সাধারণ পর্যায়ের হয়ে থাকে। হজের ওয়াজিব পালনে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ঘটলে ‘দম’ ওয়াজিব হয়। যেমন : মাথা মুড়নের C‡Cশ্যেতানকে কংকর নিষ্কেপ করা। আর ‘দম’ n‡Q একটি ছাগল, ভেড়া বা দুষ্মা কুরবানি করা। উট বা গরুর এক-সপ্তমাংশও এর স্থলাভিযিক্ত হতে পারে। সাধারণভাবে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো বা হারাম শরিফ এলাকায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ করলে প্রতিদান স্বরূপ ‘দম’ বা করবানি করতে হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদাকা দিতে হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হজ পালনের ধারাবাহিক নিয়মগুলো সংক্ষিপ্ত শিরোনামে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

ପାଠ ୯

کُرِبَانی (اُلْضَحَّة)

କର୍ବାନିର ଧାରଣା

কুরবানির সমার্থক শব্দ ‘উয়হিয়াত্’। এর আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় যিলহাজ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে পশু যবেহ করা হয় তাকে করবানি বলে।

বর্তমানে যে কুরবানি প্রথা প্রচলিত আছে, তা হয়েরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। ইহা আত্মত্যাগ ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অন্যতম মাধ্যম। ইহা একটি উন্নত ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন : “কুরবানির দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুরবানির পশুর শিং, ক্ষুর ও *tj̄ lgmḡn* নিয়ে হাজির হবে। কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌছে যাবে। অতএব তোমরা কুরবানির দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র কর।” (তিরমিয়ি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন : “সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।” (ইবনে মাজাহ)

Ki ewbi cUf̄ig

হয়েরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা বহুবার বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন। সকল পরীক্ষায় তিনি উদ্ভীর্ণ হয়েছেন। এবার তিনি এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন। বৃন্দ বয়সের একমাত্র সন্তান ইসমাইল অপেক্ষা দুনিয়াতে অধিকতর প্রিয় আর কী হতে পারে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছলেন, আল্লাহ যাতে খুশি হন তাই তিনি করবেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, তখন তিনি পুত্র ইসমাইলকে বললেন, “তিনি (ইব্রাহিম) বললেন : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী? তিনি (ইসমাইল) বললেন : হে আমার আববা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে শ্রেষ্ঠশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।” (আস্সাফ্ফাত: ১০২)

ছেলের এ *m̄n̄mKZlC* উত্তর পেয়ে নবি ইব্রাহিম (আ.) খুশি হলেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি পুত্র ইসমাইলের গলায় তরবারি চালালেন। এবারের পরীক্ষাতেও ইব্রাহিম (আ.) উদ্ভীর্ণ হলেন। পবিত্র কুরআনে আছে:

وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَلِبِّرَاهِيمَ قُدْ صَلَّقَتِ الرُّعْيَا

অর্থ: “তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম: হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে।”
(mj। আস্সাফ্ফাত, আয়াত ১০৪-১০৫)

আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে বেহেশত থেকে একটি দুষ্প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্ত এনে ইসমাইলের জায়গায় তরবারির নিচে শুইয়ে দিলেন। হয়েরত ইসমাইল (আ) এর পরিবর্তে দুষ্প্রাপ্ত কুরবানি হয়ে গেল। এ *Ace* ত্যাগের ঘটনাকে *Pi - ſ̄i Ylq* করে রাখার জন্য তখন হতেই কুরবানি প্রথা চালু হয়েছে। এটি আজ মুসলিম সমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে স্বীকৃত।

কুরবানির নিয়মাবলি ও বিধিবিধান

কুরবানির কতিপয় বিশেষ নিয়মাবলি ও বিধিবিধান নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. যিলহজ মাসের ১০ তারিখ ফজর হতে ১২ তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ *m̄m̄t̄*। মালিক (সাহিবে নিসাব) হয়, তবে তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব। মুসাফিরের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।

২. যিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন কুরবানির সময়। এ তিন দিনের যেকোনো দিন কুরবানি করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানি করা উত্তম।
৩. সেদুল আয়হার নামাযের আগে কুরবানি করা সঠিক নয়। নামায আদায়ের পর কুরবানি করতে হয়।
৪. সুস্থ সবল ছাগল, ভেড়া, দুঘা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। গরু, মহিষ এবং উটে এক হতে সাত জন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়।
৫. কুরবানির ছাগলের বয়স কমপক্ষে এক বছর হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে দুই বছরের হতে হবে। উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে। দুঘা ও ভেড়ার বয়স ছাগলের মতো। তবে ছয় মাসের বেশি বয়সের দুঘার *ei"Pi* যদি এরূপ মোটাতাজা হয় যে, এক বছরের অনেকগুলো দুঘার মধ্যে ছেড়ে দিলে চেনা যায় না, তবে সেরূপ *ei"Pi* দিয়ে কুরবানি জায়েয়। কিন্তু ছাগলের *ei"Pi* এক বছর বয়স না হলে কুরবানি জায়েয় হবে না।
৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব মিসকিনকে, একভাগ আত্মীয় স্বজনকে দিতে হয় এবং একভাগ নিজের জন্য রাখা উত্তম।
৭. নিজ হাতে কুরবানি করা উত্তম।
৮. কুরবানির প্রাণী দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে কিবলামুখী করে, ধারালো A-ং দ্বারা ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে ঘৰেহ করতে হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরবানির সময় একাগ্রতার সাথে উত্তম পশু কুরবানি করা। তাতে তাঁরা অনেক সাওয়াব পাবে। *Ci-Utti* মধ্যে আন্তরিকতা বাড়বে এবং *n-ZiCiy* পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কুরবানির *CUfij* ও নিয়মাবলি আলোচনা করবে।

পাঠ ৯

আকিকা (الْعَقِيقَةُ)

আকিকার ধারণা

‘আকিকা’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ভাঙ্গা, কেটে ফেলা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনে তার কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর নামে কোনো হালাল গৃহপালিত পশু যবাই করাকে আকিকা বলা হয়।

আকিকা করা সুন্নাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। সন্তানের বিপদাপদ-⁺ হয়। কাজেই প্রত্যেক পিতামাতার উচিত নবজাত সন্তানের নামে যথাসময়ে আকিকা করা। হাদিসে আছে, “প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু জবেহ করতে হবে। তার নাম রাখা হবে, তার মাথার চুল মুড়ন করা হবে।” (নাসাই)

নবি কারিম (স.)-এর আগে। আকিকার প্রচলন ছিল। আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে তিনি তা চালু রাখেন। মহানবি (স.) নিজে আকিকা করেছেন, অন্যকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। পিতামাতা আকিকা না করলে নিজের আকিকা নিজেও করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) নবি হওয়ার পর নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন। আকিকা সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে করা *gīlīnī*। সপ্তম দিনে না পারলে ১৪, ২১ তারিখে অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত সপ্তম দিনেও করা যায়। মাতাপিতার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সন্তান। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা উত্তম।

ক. সন্তানের ইসলামি নাম রাখা।

খ. মাথা মুড়ন করা।

গ. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা বুপা দান করা।

ঘ. আকিকা করা।

আকিকা আদায়ের নিয়ম

মুসলমানের প্রত্যেকটি বৈধ কাজই ইবাদত। ইবাদত আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। আর নিয়মমতো কাজটি সমাধা করলে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাই আকিকা করাও একটি ইবাদত এবং তা আদায়ের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: “ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবেহ করাই যথেষ্ট।” (নাসায়ি)।

আকিকার জন্য ছেলে হলে দুটি আর মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ভেড়া যবাই করতে হয় কিংবা কুরবানির গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই আর মেয়ের জন্য এক অংশ নেওয়া যায়।

যে সকল পশু দ্বারা কুরবানি করা যায় ঐ সকল পশু দ্বারা আকিকাও চলে। আকিকার পশুর বয়স কুরবানির পশুর বয়সের অনুরূপ হতে হবে।

আকিকার পশুর গোশত কুরবানির পশুর গোশতের ন্যায় তিনি ভাগ করে একই নিয়মে বণ্টন করতে হয়। এ গোশত সন্তানের পিতামাতা, ভাইবোন সকলেই খেতে পারে। এ গোশত রান্না করে আত্মীয় স্বজন ও গরিব মিসকিনকে খাওয়ানো যায়। চামড়া গরিব-মিসকিনকে দান করে দিতে হয়।

আকিকার পশু সন্তানের পিতার নিজ হাতে যবাই করা উত্তম। নিজে অপারগ হলে অন্যের সাহায্যে যবেহ করানো যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আকিকা আদায়ের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ১০

কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা

কুরবানি বলতে শুধু গরু, ছাগল, মহিষ, দুঘা ইত্যাদি যবাই করা বোঝায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন বোঝায়। কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে, “হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কৃষ্টিত হব না।” কে কত টাকা খরচ করে পশু ক্রয় করেছে, কার পশু কত মোটা তাজা, কত সুন্দর আল্লাহ তা দেখতে চান না। তিনি দেখতে চান কার অন্তরে কতটুকু আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন :

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

অর্থ: “কখনো আল্লাহর নিকট পৌছায় না এগুলোর গোশত এবং রক্ত বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।”
(mj || হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.). মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। আত্মত্যাগী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। নিজের সুখ শান্তির বাহিরে যারা সমাজের মানুষের সুখকে বড় করে দেখে, তারাই প্রকৃত মানুষ। কুরবানির ত্যাগের শিক্ষা আমাদেরকে পরোপকারে উৎসাহিত করবে ও মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটবে।

কাজ : ‘কুরবানির শিক্ষা মানুষকে আত্মত্যাগী ও পরোপকারী হতে সাহায্য করে।’ শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

হজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

হজ একাত্তরই ব্যক্তিগত ইবাদত। আল্লাহর প্রেমিক হাজিগণ আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য হজ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায় হজের মৌসুমে বিশেষভাবে ধর্মীয় ও নেতৃত্ব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা হজে যান তাঁদের মন ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত থাকে, অনুরূপভাবে যাঁরা তাঁদের বিদ্যায় সম্ভাষণ জানাতে আসে, তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় চেতনাশক্তি জাগ্রত হয়। হাজিগণ যে স্থান দিয়ে গমন করেন, তাঁদের ‘লাববাইক’ ধ্বনি শুনে সেখানকার অনেক মানুষের মনও হজের প্রতি আগ্রহী হয়।

বিভিন্ন দেশ হতে আগত হাজিদের শারীরিক অবকাঠামো, ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন কিন্তু মিকাতের (ইহরাম বাঁধার স্থান) কাছে এসে একই ধরনের কাপড় পরিধান করে। সবার মুখে একই ধরনি প্রতিধ্বনিত করে আকাশ বাতাস

মুখরিত করে তোলে। মক্কা ও মদিনায় একত্র হয়ে একই ইমামের পেছনে নামায আদায় করে। সমবেত মুসলিম জনতা ভাষা, জাতি, দেশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য ভেঙে দিয়ে বিশ্বাত্মক স্থাপনের বিরাট সুযোগ পায়। মানুষের মনে সাম্যের ধারণা জন্মায়। হজের এই মহাসম্মেলনে পৃথিবীর সব শ্রেণির মানুষই এসে সমবেত হয়। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আদান-প্রদান ঘটে। ভাব বিনিময় হয়। বিশ্বাস্তি স্থাপনে এবং R̄w̄Zmḡñi cvi-ūwi K দ্বন্দ্ব, কলহ মিটিয়ে ভালোবাসা, eÜZj ও ভাত্ত স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পায়। হজের এ শিক্ষা মানবসমাজে er-Íew̄qZ হলে, মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, হানাহানি, মারামারি ছি হয়ে ci-úti। মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও সহনশীল দৃষ্টি ভঙ্গি ও m̄ȳm̄p̄ w̄qK m̄p̄w̄Z সৃষ্টি হবে।

কাজ : ‘বিশ্বাত্মক গড়ে উঠতে হজের সামাজিক শিক্ষা গুরুত্বে পৃষ্ঠায় রাখে।’ শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে। শিক্ষক মহোদয় বিচারকের ভূমিকা পালন করবেন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

Kbjস্থান ব্রেগ কর

১. যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত ——।
২. যাকাতের মাসারিফ ——।
৩. ইসলামের ——- প্রিমে মধ্যে সালাত অন্যতম।
৪. হজের অনেক —— রয়েছে।
৫. ইহরাম —— শব্দ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ৯ই যিলহজ	কুরবানির দিবস
২. ১০ই যিলহজ	আরাফার দিবস
৩. আকিকা করা	উভয়
৪. m̄S̄l̄b জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করা	ḡ Ívn̄le
৫. আকিকা m̄S̄l̄b জন্মের সপ্তম দিনে করা	সুন্নাত

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যাকাতের সংক্ষিপ্ত ধারণা বর্ণনা কর?
২. হজের ওয়াজিব কয়টি ও কী কী?
৩. যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো কী কী?

ବର୍ଣନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ

১. যাকাতের ধর্মীয় ও নৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
 ২. সাম্য ও বিশ্বভাত্ত প্রতিষ্ঠায় হজের ভূমিকা বর্ণনা কর।
 ৩. Fe^{+2} জীবনে আত্মত্যাগী হতে করবানির শিক্ষা বর্ণনা কর।

ବ୍ୟାକୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ

1 | ӨнРө ктәи А_©Кx ?

- | | |
|----------------|----------------|
| K) msKí Kiν | L) whqvi Z Kiν |
| M) ZvI qvd Kiν | N) mvC Kiν |

2 | nR I Dgi\nci ci Kivi gva\`tg \`ixfZ nq N

- i. `wɪ `zv
 - ii. Afve
 - iii. CVC

†KvbU mWk?

3| n‡Ri dih KqJU?

- K) $\mathbb{W}\mathbb{Z}b$ L) Pvi
M) $c\mathbb{U}P$ N) $\mathbb{K}|$

নিচের Abf "Q" ॥ পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

din` mñne GKRb e`emvq| wZwb cÖZ i ghjb gvtm m¤ut` i mnme Ktib Ges wbw` S cwi gY m¤u`
Mwi e-` jLxt` i gvtS weZi Y Ktib|

4| din` mñntei KñRi gwa"tg kixqñZi tKvb weavbwJ Av` vq ntqñQ?

- | | |
|--------------|------------|
| K) ḡy—v̄ve | L) m̄p̄n̄z |
| M) l̄ q̄w̄Re | N) di h̄l̄ |

5 | din` m̄tnei ḡb̄mKz̄i d̄j w̄zb̄ ci K̄t̄j Kx c̄teb?

K) c̄j -<vi

L) w̄biw̄c̄Ēv

M) w̄zi -<vi

N) ĀwaK̄vi |

সূজনশীল প্রশ্ন

1. tb̄vi m̄tne ēem̄ K̄ti c̄Pi m̄s̄úĒi gw̄j K n̄qt̄ob | w̄zb̄ `B-GK ēQi ciciB n̄RēZ c̄j b K̄t̄b | কিন্তু তিনি Z̄i M̄i e f̄vB-teb I mḡt̄Ri `wi `Āmn̄q tj̄w̄K̄t̄ i m̄t̄_ m̄s̄úK̄i w̄Lb bv̄ G w̄t̄q mḡt̄R Pj̄t̄Q bv̄v̄ ai t̄bi K_weiZ̄P Gme K_weiZ̄P Z̄i Pv̄v̄ Av̄aj K̄i t̄gi K̄t̄b Ḡt̄j , w̄zb̄ tb̄vi t̄K ej t̄j b, òmḡt̄R abx-M̄i t̄ei `elḡ f̄jj w̄t̄q mevi c̄jZ m̄ q n̄l |

K. òBniw̄ḡk̄t̄ai A_ K̄i?

L. òerqZ̄j w̄i nR আলাহর c̄l̄c̄ | ò ēSt̄q w̄j t̄L̄v̄ |

M. tb̄vi m̄tnei K̄h̄t̄g K̄i Av̄t̄ k h̄v̄h̄_f̄t̄e c̄j b n̄q w̄b̄N ēvL̄v̄ Ki |

N. Av̄aj K̄i g m̄tnei ḡb̄mKz̄i n̄t̄Ri mḡw̄RK I m̄s̄ -< w̄ZK `w̄ofw̄t̄Z gj̄v̄qb Ki |

2. d̄vi w̄e m̄tne GKRb aḡt̄i v̄qY ēw̄³ | Gj̄w̄Kv̄ GKRJ gm̄w̄R` w̄bḡt̄Yi Rb̄ R̄qM̄i c̄t̄q̄Rb n̄t̄j v̄ | mevB w̄t̄j GKRJ PgrK̄i R̄qM̄i w̄beP̄b Kij | R̄qM̄i d̄vi w̄e m̄tnei dm̄j Drc̄t̄ t̄bi GKḡt̄ Aej p̄`b | কিন্তু সবাই w̄t̄j Ab̄t̄i va K̄i v̄q w̄zb̄ Z̄i gm̄w̄R̄t̄ i Rb̄ w̄bt̄-^v̄_F̄t̄e w̄t̄Z m̄s̄Z nb | Z̄i G K̄t̄R Z̄i eo f̄vB d̄vn̄` m̄tne অসমুক্ত nb Ges D³ R̄qM̄i w̄t̄Z c̄P̄Ēf̄t̄e evav c̄v̄b K̄t̄b |

K. w̄j nR ḡt̄mi t̄Kb Z̄i t̄L Av̄v̄d̄q Aē-`vb K̄i t̄Z n̄q?

L. òZ̄i l̄q̄d K̄i ḡò ej t̄Z Kx ēS̄v̄q?

M. d̄vi w̄e m̄tnei K̄t̄Ri ḡāt̄g Bēt̄Zi t̄Kb w̄k̄P̄w̄U c̄K̄k t̄ct̄q̄t̄Q? ēvL̄v̄ Ki |

N. d̄vn̄` m̄tnei K̄h̄t̄g nhiZ Beiw̄ng I nhiZ Bmḡw̄Cj (Av.)-Gi NUv̄i Av̄t̄j w̄t̄K w̄et̄kHY Ki |

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি *gj Z* এ উৎসদ্বয় থেকেই গৃহীত। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে মানব জীবনের সকল সমস্যার মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব *gj b*Zi** আলোকেই ইসলামের সকল বিধি বিধান প্রণীত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের নীতিমালার বাইরে কোনো কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ইসলাম *মাঝুর K*জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ *মাঝুর K*জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআন ও হাদিসের কতিপয় বিষয় *মাঝুর K*শিক্ষা লাভ করব।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।
- তাজবিদের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে।
- নির্বাচিত পাঁচটি সুরার *CUfig* (শানে নুযুল) বর্ণনা করতে পারবে।
- বিশুদ্ধ *D'Pvi fY* কুরআনের পাঁচটি সুরা অর্থসহ মুখ্যস্থ বলতে ও *gj* বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠে আগ্রহী হবে।
- *AvgvZj* কুরসি ও সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত মুখ্যস্থ বলতে এবং অর্থ লিখতে পারবে।
- নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের *figKv* ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- *C0_ঢাক্কাজ* তিনটি হাদিস অর্থসহ বর্ণনা করতে পারবে।
- নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী সামাজিক ও নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বৃক্ষ হবে।

পাঠ ১

কুরআন মাজিদ

পরিচয়

কুরআন শব্দটি আরবি। এটি কারউন (*কারউন*) শব্দমূল থেকে উদ্ভৃত। কারউন অর্থ পড়া বা পাঠ করা। অতএব, কুরআন শব্দের অর্থ হলো পাঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিনই লক্ষ-কোটি মুসলমান এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সুরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে আল-কুরআন।

ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য হ্যারত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাকেই আল-কুরআন বলা হয়। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এ কিতাব হেদায়াতের উৎস।

আল-কুরআন ‘লাওহে মাহফুয়ে’ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এটি প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের ‘বায়তুল ইয়্যাহ’ নামক স্থানে এক সাথে নাযিল করা হয়। এরপর স্থান থেকে আল-কুরআন আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর ওপর নাযিল করা হয়। মহানবি (স.)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় ধ্যানমণ্ড থাকাকালে সর্বপ্রথম সুরা আলাকের ৫টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসুলুল্লাহ (স.)-এর জীবদ্ধশায় প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়। এভাবে ২৩ বছরে খড় খড় আকারে পুরো কুরআন নাযিল হয়।

আল-কুরআনের *mj̄lmḡn* দুইভাগে বিভক্ত। যথা- মাক্কি ও মাদানি। মহানবি (স.) আল্লাহর নির্দেশে নবুয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। নবি কারিম (স.)-এর এ হিজরতের *C̄ēn* নাযিল হওয়া *mj̄lmḡn* মাক্কি সুরা হিসেবে পরিচিত। এ *mj̄lmḡn* সাধারণত আকাইদ *ms̄p̄āt̄* *ll̄qm̄ḡn eȲt̄* করা হয়েছে। যেমন- তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, বেহেশত-দোয়া, কিয়ামত ইত্যাদি হলো মাক্কি সুরাগুলোর *ll̄qē-*। অন্যদিকে মহানবি (স.)-এর মদিনায় হিজরতের পর নাযিলকৃত *mj̄lmḡn* মাদানি সুরা বলা হয়। এ *mj̄lmḡn* সালাত, যাকাত, সাওম, হজ, জিহাদ, হালাল-হারাম, মানবিক ও নৈতিক *gj̄ ūl̄a m̄p̄ūK̄* বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে এ *b̄lḡm̄ḡn* রাখা হয়েছে। এগুলো আল-কুরআনের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। নিম্নে এর কতিপয় নাম উল্লেখ করা হলো-

- ক. আল-ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** আল-কুরআন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী। এ জন্য একে আল-ফুরকান বলা হয়।
- খ. আল-হুদা (হেদায়াত, পথপ্রদর্শন) :** কুরআন মাজিদের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয় বলে একে আল-হুদা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- গ. আর রাহমান (রহমত, দয়া, করুণা) :** পবিত্র কুরআন বিশ্বাসীর জন্য রহমত ও করুণাস্বরূপ। তাই একে রাহমান বলা হয়েছে।
- ঘ. আয়-যিকর (উপদেশ, আলোচনা) :** কুরআন মাজিদে বহু ঘটনার আলোচনা ও বহু উপদেশ রয়েছে। তাই একে যিকর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- ঙ. আন-নুর (জ্যোতি, আলো) :** পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়, তাই একে ‘নুর’ বলা হয়।

কুরআন মাজিদ ৩০টি (ত্রিশটি) ভাগে বিভক্ত। এর প্রতিটি ভাগকে এক একটি পারা বলা হয়। এর সুরা সংখ্যা মোট ১১৪টি। এগুলোর মধ্যে ৮৬টি সুরা মাক্কি এবং ২৮টি সুরা মাদানি। আল-কুরআনে সর্বমোট ৭টি মনযিল, ৫৫৪টি বুকু ও ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৬২৩৬টি, মতান্তরে ৬৬৬৬টি।

আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল-কুরআন অত্যন্ত গুরু^{ZCIV}মহাগ্রন্থ। আল-কুরআন আমাদের আল্লাহ তাআলার পরিচয় দান করে। আমরা আল্লাহ তাআলাকে চিনতাম না। তাঁর ক্ষমতা ও গুণবলি ^{mj}^{PK}জানতাম না। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের প্রিয়নবি (স.)-এর ওপর কুরআন মাজিদ নাযিল করেন। মহানবি (স.) আমাদের আল-কুরআন শিক্ষা দেন। ফলে আমরা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করি। তাঁর আদেশ-নিয়েখ জানতে পারি। কী কাজ করলে তিনি খুশি হন আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা-ও জানতে পারি। আল-কুরআন না থাকলে এগুলো সম্ভব হতো না। অতএব বোঝা গেল যে, মানব জীবনে আল-কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআন মানব জাতির হেদায়াতের প্রধান উৎস। কোন পথে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে আল-কুরআন তা আমাদের দেখিয়ে দেয়। CIC-CIV, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির পরিচয় দান করে। আল-কুরআনের নির্দেশনামতো চলে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারি। আখিরাতে আল-কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নির্দেশ মেনে চলবে সে হবে মহাসৌভাগ্যশালী। সে পাবে চিরশাস্ত্রির জাহান। আর যে কুরআন মাজিদের আদেশ নিয়েখ মানবে না তার স্থান হবে যত্নগাদায়ক জাহানামে।

আল-কুরআন আমাদের নেতৃত্ব ও মানবিক আদর্শ শিক্ষা দেয়। আল-কুরআন অনুসরণ করে আমরা উত্তম চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারি। ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি ইত্যাদি ^{hifZ nte}।

কুরআন মাজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট জাতির জন্য নাযিল হয় নি। বরং এটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মহাগ্রন্থ। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সকলের হিদায়াতের জন্য এ কুরআন নাযিল হয়েছে।

আল-কুরআনের শিক্ষা

কুরআন মাজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এটি যাবতীয় জ্ঞানের ভাড়ার। এছাড়া মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উদ্দেশ্ব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ : “আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেই নি।” (সুরা আল-আনাম, আয়াত ৩৮)

আল-কুরআনের সকল জ্ঞান ও শিক্ষাই ^{mj}^{PO}। সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য। এতে উল্লেখিত সকল প্রকার আদেশ-নিয়েখ ও বিধি-বিধান সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য, যুগোপযোগী ও যুক্তিসংগত। এ কিতাবে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। আল-কুরআনের প্রথমেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ بِلَيْكَ

অর্থ : “এটি সেই কিতাব, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।” (^{mj}। আল-বাকারা, আয়াত ২)

আল-কুরআন ইসলামি শরিয়াহ'র প্রধান উৎস। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন কেমন হবে তা এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ কীভাবে ইবাদত করবে, কীভাবে চরিত্র গঠন করবে তাও এ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

প্রথ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ হয়রত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.)-এর মতে, আল-কুরআনে বহু জ্ঞানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো মোট পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ইলমুল আহকাম বা বিধি-বিধান *الْفَرِيضَةِ* জ্ঞান।
২. ইলমুল মুখাসামা বা বিতর্ক বিদ্যা।
৩. ইলমুত তায়কির বি আলা ইল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও নির্দর্শন *الْمُنْعَذِّلَةِ* জ্ঞান।
৪. ইলমুত তায়কির বি আইয়ামিল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজগতের অবস্থা, তাঁর প্রদত্ত পূরস্কার ও *كَوْفَلَةِ* সংক্রান্ত জ্ঞান।
৫. ইলমুত তায়কির বিল মাউত ওয়ামা বাদাল মাউত বা মৃত্যু ও পরকাল *الْمَوْتِ* জ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআন মানবজাতির মহামুক্তির সনদ। এটি মানুষকে আলোর দিকে পরিচালনা করে। শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব। এর অর্থ জ্ঞান এবং তদনুযায়ী আমল করব। আল-কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করব।

কাজ : এ পাঠ পড়ে কুরআন মাজিদের শিক্ষা *الْمَسْجِدِيَّ* শিক্ষার্থী যা জ্ঞানতে পেরেছে তা তার পাশের *الْمَسْجِدِ* বলবে।

পাঠ ২

তাজবিদ (الْتَّجْبِيد)

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত। এর দ্বারা বান্দা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়। শুধু তিলাওয়াতকারীই নয় বরং তিলাওয়াতকারীর মাতাপিতাও এতে সম্মানিত হন। হাদিসে এসেছে-যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে মুকুট পরানো হবে। এ *gKtUI J^{3/4}j mfhP* আলোর চেয়েও বেশি হবে। অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়।’ (বুখারি)

তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা নিজ পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।” (মুসলিম)

অতএব বোঝা গেল কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত *dīlhj ZC* আমল। আমরা বেশি বেশি নিয়মিত কুরআন পড়ব এবং অন্যকেও কুরআন পড়তে উৎসাহিত করব।

তাজবিদের গুরুত্ব

সহিহ শুন্দ্রভাবে কুরআন পাঠের রীতিকে তাজবিদ বলে। আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফফিলত লাভের জন্য সহিহ-শুন্দ্রভাবে কুরআন পড়তে হবে। আর এ জন্য তাজবিদের জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাজবিদ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং তার নামায শুন্দ্র হবে না। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া *mṣālik* আল্লাহ তাত্ত্বাল বলেন,

وَرِتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا

অর্থ : “আপনি ধীরে ধীরে ও *mṣālik* কুরআন তিলাওয়াত করুন।” (সুরা আল-মুয়ামিল, আয়াত ৪)

একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “ইলমে কুরআনে পারদশী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতার দলভুক্ত, যারা নেককার ও আল্লাহর হুকুমে লেখার কাজে *e*—। আর যে ব্যক্তি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার চেষ্টা করে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।” (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং আমরা নিয়মিত তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করব। যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে কষ্ট হয় তবু পড়তে চেষ্টা করব। কোনো অবস্থাতেই কুরআন তিলাওয়াত ত্যাগ করব না। আর তাজবিদ শিক্ষা করব। এতে আমরা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারব।

পাঠ ৩

নুন সাকিন ও তানবিনের বর্ণনা

নুন সাকিন : জ্যমযুক্ত নুনকে নুন সাকিন বলা হয়। অর্থাৎ যে নুনের ওপর জ্যম (—) থাকে তাকে নুন সাকিন বলে। যেমন- *ثُنْ-ثُنْ-ثُنْ*

তানবিন : দুই যবর (—), দুই যের (—) ও দুই পেশকে (—^৩) তানবিন বলা হয়। তানবিনের মধ্যে একটি জ্যম যুক্ত নুন উহ্য অবস্থায় থাকে। *D'Pvi tYi* সময় তা প্রকাশ পায়। যেমন- *رَجْلٌ* - এর *D'Pvi Y* হবে *رَجْلُن* -এর মতো। অর্থাৎ *ل* (লাম) হরফের তানবিনের বদলে *ل*-এর ওপর পেশ ও নুনসাকিন পড়া হয়।

নুন সাকিন ও তানবিনের হুকুম

নুন সাকিন ও তানবিনের *D'Pvi Y* একই রকম। এজন্য এ দুটির বর্ণনা *ZlRllc` kif-* একসাথে করা হয়। তাজবিদে নুনসাকিন ও তানবিনের হুকুম চারটি। অর্থাৎ চারটি নিয়মে নুনসাকিন ও তানবিনকে পড়তে হয়।

এগুলো হলো-

১. ইদগাম (إِذْغَام)
২. ইখফা (إِخْفَا)
৩. ইযহার (إِظْهَار)
৪. কালব (قُلْب)

নিচের আমরা এগুলো গুরুত্বপূর্ণ জানব।

ইদগাম

ইদগাম শব্দের অর্থ মিলিয়ে পড়া, এক জিনিসকে অন্য জিনিসের সাথে মেলানো। এক হরফকে অন্য হরফের সাথে মিলিয়ে সম্মিলিত করে পড়া।

পরিভাষায় নুনসাকিন বা তানবিনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ থেকে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন বা তানবিনের সাথে ঐ হরফকে সম্মিলিত করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয়।

ইদগামের ফলে উভয় হরফ একই সময়ে D'Pwii Z হয়। ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবিনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ (—) যুক্ত হয়। যেমন- مَنْ رَبْعٌ

ইদগামের হরফ মোট ছয়টি। যথা-

ي - ر - م - ل - و - ن

এগুলোকে একত্রে يَرْمُلُونَ বলা হয়। ইদগাম মোট দুই প্রকার। যথা :

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম

ক. গুন্নাহসহ ইদগাম : নুনসাকিন বা তানবিনের পর যি - و - م - ن - ل - ي এই চারটি হরফের যেকোনো একটি আসলে নুনসাকিন বা তানবিনকে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে এক আলিফ সময় পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে গুন্নাহসহ ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগামে নাকিস। যেমন- حَطَّةَنْفِرْلُكْه-. مَنْ يَقُولْ لَكْه- এখানে ن নুন সাকিন ও তানবিন এর পর ইয়া (ي) এবং ن (নুন) হরফ আসায় নুনসাকিন ও তানবিনকে ইয়া ও নুন এর সাথে মিলিয়ে এক আলিফ সময় পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

খ. গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম : নুন সাকিন বা তানবিনের পর ر - ل (রা, লাম) এ দুটি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ না করে ঐ হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়। একে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম বলে। এর অন্য নাম ইদগামে কামিল। যেমন : مَنْ لَلْنَكَ-غَفُورَرَحِيمٌ

ওপরের উদাহরণ দুটিতে নুন সাকিন ও তানবিনের পরে ر (রা) এবং ل (লাম) হরফ এসেছে। ফলে নুন সাকিন ও তানবিনকে এদের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে এক্ষেত্রে গুন্নাহ করা যাবে না।

ব্যতিক্রম : ইদগামের নিয়মে আমরা কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাই। যেমন- صَنْوَانٌ-بُنْيَانٌ-دُنْيَا

এ kāmgħn নুনসাকিনের পর ডি ইয়া এবং ও (ওয়াও) হরফ এসেছে। কিন্তু এখানে ইদগামের নিয়মে নুনসাকিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে তাশদিদসহ পড়া হয় না। এর কারণ হলো- ইদগামের উদ্দেশ্য হলো শব্দের D"Pi Yi K সহজ করা। এসব শব্দে মিলিয়ে পড়লে D"Pi Yi কঠিন হয়ে যায়। এজন্য এ শব্দগুলোতে ইদগাম হয় না।

ইখফা (إِخْفَاء)

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা-

ت-ث-ج-د-ذ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ف-ق-ك

নুনসাকিন বা তানবিনের পর ইখফার হরফ থেকে যেকোনো একটি হরফ এলে উক্ত নুনসাকিন বা তানবিনকে চন্দ্রবিন্দু D"Pi Yi করার মতো নাসিকা সংযোগে গোপন করে এক আলিফ সময় পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইখফা বলে।

নুনসাকিনের মধ্যে ইখফার উদাহরণ :

مِنْ تَحْبِهَا - مُنْذِرِينَ - مِنْ كُمْ - مِنْ سِجِّيلَ - مِنْ فَعَلَ - عَنْدِي

তানবিনের মধ্যে ইখফার উদাহরণ :

ذَرَّةٌ شَرَّأْ - نِعْمَةٌ تُجزِي - ظَلَّا ظَلِيلًا

ইয়হার (إِيْهَار)

ইয়হার শব্দের অর্থ ـيـ করে পড়া, প্রকাশ করে দেওয়া ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় নুন সাকিন বা তানবিনের পর ইয়হারের কোনো একটি হরফ আসলে ঐ নুন সাকিন বা তানবিনকে গুন্ঠাই না করে ـيـ ভাবে নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে ইয়হার বলে।

ইয়হারের হরফ মোট ছয়টি। যথা- خ ح ع غ

এ হরফগুলোকে হরফে হালকি বলা হয়।

مِنْ حَيْرٍ - مِنْ عَزِيزٍ عَلَيْهِ

কালব বা ইকলাব (إِقْلَاب)

কালব বা ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। তাজবিদের পরিভাষায় নুনসাকিন বা তানবিনের পর ব (বা) হরফ আসলে ঐ নুনসাকিন বা তানবিনকে মিম (ম) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ গুনাহসহ পড়াকে কালব বা ইকলাব বলে।

ইকলাবের হরফ মাত্র একটি। এটি হলো- ب (বা)। উদাহরণ: مِنْ بَعْدِ - سَمِيعٌ بَصِيرٌ

উল্লেখ্য, কুরআন মাজিদে ইকলাবের অবস্থায় নুন সাকিন বা তানবিনের পাশে ছোট করে মিম হরফটি উল্লেখ থাকে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নুন সাকিন ও তানবিনের নিয়ম চারটি লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে

পাঠ ৪

মিমসাকিনের বর্ণনা

মিমসাকিন : জয়মযুক্ত মিম (م) কে মিমসাকিন বলে। অর্থাৎ মিম হরফের ওপর জয়ম (ـ) থাকলে তাকে মিম সাকিন বলা হয়। যেমন- **كُم**

মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি: যথা-

ক. ইয়হার (يَهْرِ)

খ. ইদগাম (إِدْغَام)

গ. ইখফা (إِخْفَا)

ইয়হার

ইয়হার অর্থ -يَوْ করে পড়া। মিম সাকিনের পর ب (বা) এবং م (মিম) ছাড়া অন্য যে কোনো হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে -يَوْ করে গুনাহ ব্যতীত নিজ মাখরাজ থেকে পড়াকে মিম সাকিনের ইয়হার বলা হয়। যথা- **كُم دِينْكُم - أَمْ لَمْ تَنْزِرْهُمْ**

ইদগাম

ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। জয়মযুক্ত মিম-এর পর হরকত যুক্ত মিম এলে উভয় মিমকে একসাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুনাহ করে পড়াকে ইদগাম বলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মিমের ওপর তাশদিদ যুক্ত হয়।

যেমন- **فِي قُلْبِهِمْ مَرْضٌ**

ইখফা

ইখফা অর্থ গোপন করে পড়া। মিম সাকিনের পর ب (বা) আসলে ঐ মিম সাকিনকে এক আলিফ সময় পরিমাণ গুনাহ করে পড়তে হয়। একে মিম সাকিনের ইখফা বলে। যথা-

عَلَيْكُمْ إِلَمْوُمِينِ - وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

কাজ : মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি শিক্ষার্থী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

নাযিরা তিলাওয়াত হলো দেখে দেখে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা। নাযিরা তিলাওয়াতের ফযিলত অনেক। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের ফযিলতের বর্ণনা আমরা জেনেছি। অতএব আমরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব এবং এর পূর্ণ ফযিলত লাভ করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী। আল্লাহ তাআলা যেমন মহান তেমনি তাঁর পবিত্র কালামও মহান। আল্লাহর কালামের মর্যাদা অন্য সব কালামের চেয়ে এত বেশি, যেমন আল্লাহতাআলার মর্যাদা mg^{-1} স্ফটিজগতের চেয়ে বেশি। অতএব, $mfe^{99}P$ সমান ও আদবের সাথে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ক. $C\neq F\neq C$ ওযু করে পাক-পবিত্র স্থানে বসা।
- খ. কেবলামুখী হয়ে নামায়ের অবস্থার মতো বসা।
- গ. তিলাওয়াতের আগে কয়েক বার দুরদ শরিফ পড়া।
- ঘ. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে তিলাওয়াত শুরু করা।
- ঙ. হিফয বা মুখস্থ করার নিয়ত না থাকলে ধীরে স্থিরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।
- চ. সক্ষম হলে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা।
- ছ. অর্থ বুঝে না আসলে কুরআন মাজিদের প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া।
- জ. সুন্দর সুরে তিলাওয়াত করা।
- ঝ. তিলাওয়াতের সময় কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।
- ঞ. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।
- ট. তিলাওয়াত শেষে খুব সমান ও তাযিমের সাথে কুরআন মাজিদকে পবিত্র উঁচুস্থানে রেখে দেওয়া।

আমরা আদবের সাথে নিয়মিত কুরআন পড়ব। পবিত্র কুরআনের প্রতি যেন কোনোরূপ বেয়াদবী না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখব।

কাজ :

এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো- সুরা বাকারার ৯ম বুকু থেকে ১২তম বুকু পর্যন্ত ।

শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে তাজবিদসহ এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করাবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। কোনো কথা বলবে না, কোনোরূপ হাসি-তামাসা, হট্টগোল করবে না।

এরপর শিক্ষার্থীরা একেকজন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো সংশোধন করে নেবে।

অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শুন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা তাজবিদসহ শুন্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করতে শিখবে। এরপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতে Af^۱ হবে।

অর্থ ও Cufigmn কুরআনের কতিপয় mij v

পাঠ ৬

mij v আল-কাদর (سُورَةُ الْقَدْرِ)

সুরা আল-কাদর আল-কুরআনের অত্যন্ত ghf^۱ মাজিদেসুরা। এটি মুক্ত নগরীতে অবস্থিত অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। সুরা আল-কাদর কুরআন মাজিদের ৯৭তম সুরা। এ সুরায় ‘লাইলাতুল কাদর’-এর ফয়লত বর্ণনা করা হয়েছে। এ সুরায় লাইলাতুল কাদর শব্দটি মোট তিনবার এসেছে। এর কাদর শব্দ থেকে এ সুরার নাম রাখা হয় সুরা আল-কাদর।

শানে নুয়ুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) বনি ইসরাইলের এমন একজন লোক mg^۱ আলোচনা করছিলেন যিনি mg^۱ রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং সারাদিন জিহাদ করতেন। এভাবে এক হাজার মাস ঘাবৎ অবিরাম আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ বিবরণ শুনে সাহাবিগণ we^۱ প্রকাশ করলেন। অতঃপর নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আফসোস করতে লাগলেন।

সাহাবিগণ ভাবলেন- আমরা এক হাজার মাস ইবাদত করার সুযোগ পাব না। অথচ ce^۱ Z^۱ বহু বছর বেঁচে থাকতেন। বেশিদিন ইবাদত করার সুযোগ পেতেন। ফলে আমরা ইবাদতের সওয়াবে কোনোদিন তাদের সমান হতে পারব না। সাহাবিগণের আফসোসের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করেন। এতে তিনি জানিয়ে দেন যে, j^۱ B^۱ j^۱ Z^۱ কদরের এক রাতের ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

শব্দার্থ

أَنْزَلْنَا	- আমি অবতীর্ণ করেছি, নাযিল করেছি	تَنَزَّلُ	- অবতীর্ণ হয়, নাযিল হয়, অবতরণ করে।
لَيْلَةٌ	- রাত, রজনী	الْمَلِئَةُ	- ফেরেশতাগণ
الْقَدْرِ	- পরিমাণ, ভাগ্য, মর্যাদা, মহিমা	وَالرُّوحُ	- আত্মা, জিবরাইল (আ.) এর অপর নাম বুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা
لَيْلَةُ الْقَدْرِ	- মহিমান্বিত রাত	إِذْنٌ	- অনুমতি, অনুমোদন
مَا	- কী, যা	حَتَّىٰ	- পর্যন্ত, যতক্ষণ না
حَيْثُ	- ভালো, উত্তম	سَلَامٌ	- শান্তি
أَلْفٌ	- হাজার, সহস্র	مَطْلَعٌ	- আবির্ভাব, উদয়
شَهْرٌ	- মাস	الْفَجْرٌ	- প্রভাত, ফজরের সময়, উষা।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○

- নিচয়ই আমি এটি (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○

- আর আপনি কি জানেন এ মহিমান্বিত রাতটি কী?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْثُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○

- মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنَزَّلُ الْمَلِئَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ○

- সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও বুহ (জিবরাইল ফেরেশতা) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعَ الْفَجْرِ ○

- সে রাতের উষা উদয় হওয়া পর্যন্ত শান্তি শান্তি (বিরাজ করে)।

ব্যাখ্যা

লাইলাতুল কাদর বা কাদরের রাত অত্যন্ত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত রাত। আল্লাহ তাআলা এ রাতেই পবিত্র কুরআন নাফিল করেন। এ রাতের ইবাদত হাজার মাস একাধারে ইবাদত করার চাহিতে উভয়। এক হাজার মাস ৮৩ বছর ৪ মাসের সমান। আমাদের আযুষ্কাল খুবই সীমিত। এ অবস্থায় এ রাতে ইবাদত করলে আমাদের নেকির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ। এ রাতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে রহমত, বরকত ও শান্তির সওগাত দিয়ে প্রেরণ করেন। এ রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুখ-শান্তি ও রহমত বিরাজ করতে থাকে।

শিক্ষা : এ সুরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা পাই:

- j \|Bj \|Zj কদর অত্যন্ত মহিমান্বিত রাত।
- এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উভয়।
- এ রাতে ফেরেশতাগণ শান্তি ও কল্যাণ নিয়ে দুনিয়ায় নেমে আসেন।
- এ রাতে সারাক্ষণ শান্তি ও রহমত বর্ণিত হয়।

আমরা যথাযথভাবে j \|Bj \|Zj কদর উদ্যাপন করব। বেশি বেশি নফল ইবাদত বন্দেগি করব। এ রাতের সামান্য সময়ও আমরা ইবাদত না করে কাটাৰ না। তাহলে আমরা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা বেশি সওয়াব লাভ করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনে শান্তি ও কল্যাণ দান করুন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এ সুরার শানে নৃযুল পড়বে এবং তা তাদের খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সুরা আল-বায়িনাহ (سُورَةُ الْبَيْنَةِ)

সুরা আল-বায়িনাহ আল-কুরআনের ৯৮তম সুরা। এটি পবিত্র মদিনা নগরীতে নাফিল হয়। এর আয়াত সংখ্যা আটটি। এ সুরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত বায়িনাহ শব্দ থেকে এ সুরার নামকরণ করা হয়।

শানে নৃযুল

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে মদিনায় ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্রিক প্রভৃতি সম্প্রদায় বসবাস করত। এদের মধ্যে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের কিতাবের মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর আগমন $\text{M}\ddot{\text{U}}\text{K}$ জানতে পেরেছিল। এ সময় তারা বলত যে, শেষ নবি আগমন করলে আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ইমান আনব। কিন্তু নবি কারিম (স.) -এর আবির্ভাবের পর তাদের অনেকেই ইমান আনল না। এমনকি মহানবি (স.) মুক্ত থেকে মদিনায় হিজরত করে আসার পরও তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। বরং তাদের মধ্যে মুফ্টিমেয় কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের CEFCI । এই অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাফিল করেন।

শব্দার্থ

الْبَيِّنَةُ	- myúÓ প্রমাণ, অকাট্য দলিল
أَهْلُ الْكِتَبِ	- কিতাবিগণ, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব বলা হয়।
كُفُّرُوا	- তারা কুফরি করেছে, তারা অস্মীকার করেছে
الْمُشْرِكُونَ	- মুশরিকরা
مُنْفَكِّرُونَ	- যারা Wbঘোকে, পৃথক থাকে, বিরত থাকে।
صُنْفًا	- সহিফা, পবিত্র গ্রন্থ, আসমানি ছোট কিতাব
مُظَاهَّةٌ	- পবিত্র
كُتُبٌ	- কিতাব, বিধি
تَفَرَّقَ	- বিভক্ত হলো, পৃথক হলো
إِلَّا	- ব্যতীত, ছাড়া
بَعْدِ	- পরে

مُحْلِصِينَ	- সরল, বিশুদ্ধ চিন্তা, যারা সকল দোষ থেকে মুক্ত
حُنَفَاءُ	- হানিফ, একনিষ্ঠ, যারা সঠিক পথের অনুসারী
الدِّينُ	- ধর্ম, জীবন বিধান
خَلِيلُونَ	- চিরস্থায়ী, স্থায়ীভাবে অবস্থানকারী
شُرُّ	- নিকৃষ্ট, খারাপ
الْبَرِّيَّةُ	- স্মর্তি
خَيْرٌ	- উত্তম, ভালো, শ্রেষ্ঠ
خَشْيَ	- বিধান- ভয় করে
تَجْزِيرٌ	- প্রবাহিত হয়
الْأَنْهَرُ	- bnimgn, b`xmgan
رَضِيٌّ	- সন্তুষ্ট হয়েছেন, সন্তুষ্ট

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكُونَ مُنْفَكِّرُونَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ ۝

- কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল তারা ও মুশরিকরা তাদের নিকট myúÓ প্রমাণ না আসা পর্যন্ত নিজ মতে অবিচল ছিল।

رَسُولٌ مِّنَ الْلَّهِ يَتَّلَوُ عَحْفًا مُّظَهَّرًا

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসুল পবিত্র গ্রন্থ তিলাওয়াত করেন।

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

৩. যাতে (সে সহিফায়) রয়েছে সঠিক বিধান।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

৪. যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো তাদের নিকট mgp কিতাব আসার পরই বিভক্ত হলো।

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ خُلِّصِينَ لَهُ الَّذِينَ ۖ حَنَّفَاءٌ وَّبِقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُورَةَ وَذَلِكَ دِينُ

الْقِيمَةِ

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে, সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। আর এটাই তো সঠিক দীন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكُونَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِيلُهُمْ فِيهَا ۖ أَوْلَئِكَ هُمُ شُرُّ

الْبَرِيرَةِ

৬. নিশ্চয়ই কিতাবিদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা ও মুশরিকরা জাহানামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أَوْلَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيرَةِ

৭. নিশ্চয়ই যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির মধ্যে উত্তম।

جَزَأً أُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدِينٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الْأَمْلَهُ خَالِيلُهُمْ فِيهَا أَبْشِرْ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

৮. তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের প্রতিদান- স্থায়ী জান্মাত, যার তলদেশ দিয়ে b` mgm প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

ব্যাখ্যা

এ সুরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে মদিনার ইয়াতুন্দি ও খ্রিস্টানদের ইমান আনার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াতুন্দি খ্রিস্টানরা নবি (স.)-এর প্রতি ইমান আনার কথা বলত। কিন্তু তারা রাসুল (স.)-এর প্রতি ইমান আনে নি। অথচ ইমান আনা তাদের জন্য জরুরি ছিল। কেননা তারা ce Z কিতাবে এ mgf K জেনেছিল। পরবর্তী Avg Zmg f ইমান আনার পুরস্কার এবং না আনার KW mgf K বর্ণনা করা হয়েছে। e` Z যারা আল্লাহ ও রাসুলের (স.) প্রতি ইমান আনে তারাই সফলকাম। সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ। জান্মাতের সকল নেয়ামত তারা উপভোগ করবে। অন্যদিকে যারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে তারা তো সকল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। তারা অকৃতজ্ঞ। তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহানাম।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ :

- ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা জানা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করে নি।
- সকলের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আন।
- ইমানের পর একনিষ্ঠভাবে ইবাদত তথা সালাত, যাকাত ইত্যাদি আদায় করতে হবে।
- কাফির ও পাপীরা হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি। তাদের স্থান জাহানাম।
- নেককারগণ সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি। তারা জানাতে প্রবেশ করবে।
- আল্লাহ তাআলা নেককারদের ওপর সন্তুষ্ট।

আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি দৃঢ়ভাবে ইমান আনব। অতঃপর একনিষ্ঠভাবে তাঁদের আনুগত্য করব। তাহলেই আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি খুশি হবেন। আমাদের জানাত দান করবেন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা এ সুরার শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি চার্ট তৈরি করে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিতে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৮

সুরা আল-যিলযাল (سُورَةُ الْزِلْزَالِ)

আল-কুরআনের ৯৯তম সুরা আল-যিলযাল। এ সুরায় আধিরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সুরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত যিলযাল শব্দ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে সুরা আল-যিলযাল। এটি মদিনা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা আটটি।

শানে নূযুল

একদা জনৈক ব্যক্তি একজন কাফিরকে অতি অল্প পরিমাণ খাদ্য দান করে। অতঃপর সে বলল যে, এ সামান্য দানে কি সওয়াব হবে?

অপর এক ব্যক্তি ছোট ছোট গুনাহ করত। এগুলো থেকে বিরত থাকত না। বরং সে এগুলোকে অবহেলা করত। আর এগুলোর কোনো গুরুত্ব দিত না।

এ দু'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করেন। আর সকলকে জানিয়ে দেন যে, পুণ্য বা পাপ তা যত ছোটই হোক না কেন কিয়ামতে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অতঃপর এগুলোর জন্যও পুরস্কার বা *Kwâf* ভোগ করতে হবে।

শব্দার্থ

إِذَا	- যখন	يَصُدُّ	- বের হবে, প্রকাশিত হবে
زُلْزَلٍ	- K̄l̄z̄l̄ হবে	أَشْتَانًا	- ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পৃথক পৃথকভাবে
الْأَرْضُ	- জমিন, পৃথিবী, মাটি	أَعْمَالٌ	- আমলসমূহ
وَأَخْرَجَتِ	- বের করে দেবে	مِثْقَالٌ	- পরিমাণ
أَثْقَالَ	- t̄al̄S̄mḡ, f̄im̄ḡ	ذَرَّةٌ	- ॥e`y Ay ৰূপ্য Ask
قَالَ	- বলবে	خَيْرٌ	- উত্তম, ভালো
يَوْمَئِنِ	- সেদিন	شَرٌّ	- মন্দ, খারাপ, নিকৃষ্ট
تُحَدِّثُ	- বর্ণনা করবে, কথা বলবে	يَوْمٌ	- সে তা দেখবে
أَخْبَارَ	- m̄sev̄ mḡ, Leim̄ḡ		

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

إِذَا زُلْزَلِتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

১. যখন পৃথিবী আপন K̄l̄z̄l̄ প্রবলভাবে C̄K̄l̄z̄l̄ হবে।

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

২. আর পৃথিবী যখন তার (অভ্যন্তরস্থ) f̄im̄ḡ বের করে দেবে।

وَقَالَ إِلَّا نَسْأُ مَا لَهَا ۝

৩. এবং মানুষ বলতে থাকবে এর (পৃথিবীর) কী হলো?

يَوْمَئِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

৪. সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

بِإِنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا

৫. কেননা আপনার প্রতিপালক তাকে (এজন্য) আদেশ করবেন।

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَأْتَاهُ لَيْرُوا أَعْمَالَهُمْ

৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের Avgj mgm দেখানো যায়।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

৭. কেউ অণু পরিমাণ সংকাজ করলে তা সে দেখবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

৮. আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এক সময় গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তিনি হ্যরত ইসরাফিল (আ.)-কে শিজায় ফুঁকার দেওয়ার আদেশ দেবেন। হ্যরত ইসরাফিল (আ.)-তখন শিজায় ফুঁক দেবেন। তাঁর শিজায় শব্দে সারা পৃথিবীর mg-। নিয়ম-K;Lj। ভেজে যাবে। পৃথিবী চরমভাবে কাঁপতে থাকবে। পৃথিবীর দালানকোঠা, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা mg-। কিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আসমান ভেজে যাবে। fC। তার ভেতরের সব কিছু বের করে দেবে। Keimgm থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে। এসব কিছু দেখে মানুষ আশ্চর্যাপ্ত হয়ে যাবে। এরপর সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্র হবে। সেখানে তাদের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজকর্মও সেদিন হিসাবের বাইরে থাকবে না। বরং ছোট পাপ করলেও তার kW-। পেতে হবে। অন্যদিকে অণু পরিমাণ C। করলেও সেদিন মানুষ তার আমলনামায় দেখতে পাবে। এ পরিমাণ C।।। প্রতিদান দেওয়া হবে।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- কিয়ামতে পৃথিবীর অবস্থা হবে ভয়াবহ। mg-। কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
- মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে।
- হাশরের ময়দানে মানুষ নিজ নিজ আমলনামা দেখতে পাবে।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ বা C। কোনো কিছুই এ আমলনামায় বাদ পড়বে না।

আমরা সর্বদা কিয়ামত, হাশর ও আখিরাতের কথা স্মরণ রাখব। সেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। CIV-CIV' যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন সেদিন তাও আমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে। সুতরাং আমরা ছোট বড় কোনো পাপকে অবহেলা করব না, বরং সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থী সুরা ফিল্যালের চারটি শিক্ষা তার পাশের সহপাঠীকে বলবে এবং তা খাতায় লিখবে।

পাঠ ৯

সুরা আল-ফিল

সুরা ফিল আল-কুরআনের ১০৫তম সুরা। এটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচটি। ফিল অর্থ হাতি। এ সুরায় nūr-eownbxi করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সুরার নাম রাখা হয়েছে সুরা ফিল।

শানে নুযুল

আরবের ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তার নাম ছিল আবরাহা। সে ছিল খ্রিস্টীন। সে সানাতা নামক স্থানে একটি সুন্দর ও বহু মণিমুক্তা খচিত গির্জা তৈরি করে। অতঃপর মানুষকে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আহ্বান করে। সে চাইল মানুষ যেন মক্কা শরিফে অবস্থিত পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনার জন্য আগমন করে। কিন্তু মানুষ কাবাগৃহকে খুব সম্মান করত। সুতরাং তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল না। তারা আগের মতোই কাবাগৃহে উপাসনা করতে লাগল। এতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চিন্তা করল- কাবাগৃহ ধ্বংস না করলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। এ জন্য সে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য মক্কা নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করে। সে বহু সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৩টি বিশালকায় শক্তিশালী হাতি নিয়ে অগ্রসর হয়।

আবরাহার আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রাসুলুল্লাহ (স.)-এর দাদা ও কুরাইশদের সর্দার। তিনি জানতেন যে কাবা হলো আল্লাহর ঘর। সুতরাং এ ঘরের রক্ষার দায়িত্বও আল্লাহরই ওপর। আব্দুল মুত্তালিবের নির্দেশে কুরাইশগণ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পরদিন ভোরে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে কাবা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এমন সময় আল্লাহ তাআলা সম্মুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করলেন। এগুলো ছিল একপ্রকার ছোট পাখি। এরা দুই পায়ে দুটি এবং ঠাঁটে একটি করে কংকর নিয়ে এলো। অতঃপর এগুলো আবরাহার বাহিনীর ওপর নিষ্কেপ করল। ফলে আবরাহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আর আবরাহা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল। পরে তার ক্ষতস্থানে পচন ধরে এবং ভয়ঙ্কর কফের পর সে মারা যায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর ঘরকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

nūr-eownbxi ঘটনাটি ৫৭০ সালে সংঘটিত হয়। আমাদের প্রিয়নবি (স.) এ বছরই জন্মগ্রহণ করেন। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জন্মের ৫০দিন C'eঘটেছিল। আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাযিল করে এ বিশেষ ঘটনা সকলকে জানিয়ে দেন।

শব্দার্থ

الْمَرْتَرَ	- আপনি কি দেখেন নি?	أَرْسَلَ	- তিনি প্রেরণ করেন।
كَيْفَ	- কীভাবে, কীরূপে	طِيرًا	- পাথি
أَصْحَابٍ	- সজীগণ, সাথীগণ, অধিপতি, মালিক	أَبِيلِيْلَ	- আবাবিল, একপ্রকার ছোট পাথি যা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে
الْفِيلِ	- হাতি	جَارِّةٌ	- পাথর
الْمَرْجِعُ	- তিনি কি করেন নি?	سِجِيلِ	- কংকর, নুড়ি পাথর
كَيْدَ	- ঘড়যন্ত্র, গোপন চৱাণি, কৌশল	عَصْفٌ	- তৃণ, খড়-কুটো
تَضْلِيلِ	- ব্যর্থতা, ব্যর্থ করে দেওয়া	مَأْكُولٌ	- ভক্ষিত, যা ভক্ষণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

الْمَرْتَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

১. আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রতিপালক ॥ ৰ্ই । বাহিনীর প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন?

الْمَرْجِعُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۝

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি ?

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيرًا أَبِيلِيْلَ ۝

৩. আর তিনি তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে পাথি প্রেরণ করেন।

تَرْمِيهِمْ بِجَارِّةٍ مِّنْ سِجِيلِ ۝

৪. সেগুলো তাদের ওপর কংকর জাতীয় পাথর নিষেগ করে।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولٍ ۝

৫. অতঃপর তিনি তাদের ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।

ব্যাখ্যা

ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহ ছিল অনেক abm̄pū` ও সৈন্য-সামন্তের অধিকারী। তার ছিল বিশাল nw̄-Iewnbx। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতের তুলনায় এসব abm̄pū` , ক্ষমতা কিছুই না। বরং আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই হয়। তিনি যাকে যেভাবে B"Qv লাঙ্গিত, অপমানিত করতে পারেন।

আবরাহ গর্ব ও অহংকারবশত আল্লাহ তাআলার সাথে শত্রুতা করে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ছেট ছেট পাখির সাহায্যে তার বিশাল বাহিনী ধ্বংস করে দেন। e-' Z এটা ছিল আল্লাহর কুদরত মাত্র। আল্লাহর সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতাকারীদের তিনি এভাবেই ধ্বংস করে থাকেন।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহদ্বারাহীদের আল্লাহ তাআলা দ্রষ্টান্তমূলক k̄w̄-। দেন।
- তিনি তাদের mḡ-। কলাকৌশল ব্যর্থ করে দেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা m̄pūtK-বিশ্বাস রাখব। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। তাঁর দীনের সাথে কখনো শত্রুতা করব না।

কাজ : সুরা ফিল নাযিল হওয়ার Cufiqg m̄pūtK-শিক্ষার্থী eŪtK বলবে এবং এ সুরার শিক্ষা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করবে।

পাঠ ১০

সুরা কুরাইশ

সুরা কুরাইশ হলো মাক্কি সুরা। এর আয়াত সংখ্যা চারটি। এটি আল-কুরআনের ১০৬তম সুরা। এ সুরায় মক্কা নগরীর কুরাইশদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে সুরা কুরাইশ।

শানে নুয়ুল

পবিত্র কাবাগৃহ মক্কা নগরীতে অবস্থিত। এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার দায়িত্ব ছিল কুরাইশ সম্প্রদায়ের ওপর। এজন্য কুরাইশগণ বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করত। লোকজন তাদের সম্মান করত। তাদের নেতৃত্ব মেনে চলত। তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করার সাহস পেত না। এ সুযোগে তারা সিরিয়া, ইয়ামান প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারীরা তাদের বাধা দিত না। এমনকি শীত-গ্রীষ্মের C̄ZKj পরিবেশেও তারা সকলের সহযোগিতায় নির্বিঘে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে পারত। তাছাড়া হজ উপলক্ষে বিপুল লোকজন মক্কা নগরীতে আসত, এতে করেও K̄vBkMY বহু অর্থ-m̄pū` লাভ করত।

কুরাইশদের এসব মানসম্মান ও abm̄pū` ছিল gjZ কাবা গৃহের বদৌলতে। সুতরাং তাদের উচিত ছিল এ গৃহের প্রভুর সেবা করা। অথচ তারা তা করত না। বরং তারা ছিল মুশরিক। তারা gjZ̄R। করত। আল্লাহর

একত্বাদে বিশ্বাস করত না। রিসালাত ও আখিরাতেও তারা বিশ্বাস করত না। এমনকি রাসুলুল্লাহ (স.) যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন তখনো তারা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। এ জ্যন্য ও অনৈতিক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ সুরা নাফিল করে তাদের সতর্ক করে দেন।

শব্দার্থ

إِلَّا فِ	- আসন্তি, অনুরাগ	الَّذِي	- যিনি, যে
قُرْبَيْشٌ	- কুরাইশ বংশীয় লোক	أَطْعَمَهُ	- আহার দিয়েছেন
رِحْلَةٌ	- অমণ, সফর	هُمْ	- তাদের
الشِّتَاءُ	- শীতকাল	جُوعٌ	- ক্ষুধা
الصَّيْفُ	- গ্রীষ্মকাল	أَمْنٌ	- নিরাপদ করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন
هَذَا	- এই	خَوْفٌ	- ভয়-ভীতি
الْبَيْتُ	- ঘর, বাড়ি		

অনুবাদ

○ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

○ لِإِلَّافِ قُرْبَيْشٍ

১. যেহেতু কুরাইশের আসন্তি রয়েছে।

○ إِلَّافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

২. আসন্তি রয়েছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

○ فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

৩. অতএব, তারা এ ঘরের মালিকের ইবাদত করুক।

○ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

৪. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন আর তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়-ভীতি থেকে।

ব্যাখ্যা

এ সুরায় কুরাইশদের নানা নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব নিয়ামতের পরিবর্তে তাদের কী করা উচিত এ *মাফিক*-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মক্কা নগরীতে কাবা গৃহ অবস্থিত। কাবা হলো আল্লাহর ঘর। এ জন্য আল্লাহ তাআলা মক্কার কুরাইশদের নানা সুবিধা প্রদান করেন। তিনি তাদের সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা দান করেন। ক্ষুধা ত্রুষ্ণায় খাদ্য, পানীয় দান করেন। সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। যে ঘরের বদৌলতে তারা এসব লাভ করলো সে ঘরের মালিকের ইবাদত করা। কেননা তিনিই তাদের এসব দান করেছেন।

শিক্ষা : এ সুরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

- আল্লাহ তাআলা আমাদের খাদ্য-পানীয় ও নিরাপত্তা দান করেন।
- তিনি সকল নিয়ামতের মালিক।
- সকলেরই উচিত তাঁর ইবাদত করা।

অতএব, আমরা সবসময় আল্লাহর ইবাদত করব। তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করব। তাহলে তিনি আমাদের প্রতি নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেবেন।

কাজ : সুরা কুরাইশের তিনটি শিক্ষা শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখিবে ও শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

আয়াতুল কুরসি

আলোচ্য আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সুরা আল-বাকারার ২৫নেং আয়াত। এটি আল-কুরআনের সর্বাধিক *ghfirat* আয়াত।

কুরসি শব্দের অর্থ *GKe⁻*। সাথে অন্য *e⁻*। মিলানো। এ জন্য চেয়ার বা আসনকে কুরসি বলা হয়। কেননা আসনে অনেক কাঠকে একত্র করা হয়। কুরসি শব্দের অন্য অর্থ হলো সাম্রাজ্য, মহিমা, জ্ঞান ও সিংহাসন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার পরিচয়, ক্ষমতা, মহিমা ও গৌরবের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতকে *Aql Zj Ki llm* বলা হয়।

ফাইলত

আয়াতুল কুরসি অত্যন্ত বরকতময় আয়াত। রাসুল (স.) এ আয়াতকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। মহানবি (স.) বলেছেন- ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাধা থাকে না।’ (নাসাই)

অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে ও শয়নকালে Alqalij Kilm পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিয়ি)

অপর এক হাদিসে এসেছে, একদা, ‘রাসুল (স.) উবাই ইবনে কাবকে জিজ্ঞাসা করলেন- কুরআনের কোন আয়াতটি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ উবাই (রা.) বললেন, তা হলো আয়াতুল কুরসি। উত্তর শুনে রাসুল (স.) তা সমর্থন করলেন এবং বললেন- হে আবুল মুনফির [উবাই (রা.)-এর ডাকনাম] এ উত্তম জ্ঞানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’ (সহিহ মুসলিম)

শব্দার্থ

الله	- ইলাহ, মাঝুদ,	خلف	- পেছনে
هو	- সে, তিনি	(لَا) يَعْلَمُونَ	- তারা আয়ত করতে পারে না, বেষ্টন করতে পারে না
الْحَقِّ	- চিরঝীব	شَيْءٍ	- জিনিস, e-īy
الْقَيْوْمُ	- W i- V q, সর্বসত্ত্ব ধারক	عِلْمٌ	- জ্ঞান
لَا تَخْدُنَ	- তাকে U k করে না	شَاءَ	- তিনি B "Q করেছেন
سِنَة	- তন্দু	وَسِعَ	- তা W -īZ হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে
نَوْمٌ	- ঘুম, নিদ্রা	لَا يَنْوُدُهَا	- তাকে ঝান্ত করে না, তার জন্য কষ্টকর হয় না
السَّمَوَاتِ	- A lmgbmgn	حِفْظٌ	- রক্ষণাবেক্ষণ
الْأَرْضِ	- জমিন, পৃথিবী, f-Cō	عَلِيٌّ	- মহান, mD"p
يَشْفَعُ	- সে সুপারিশ করবে	عَظِيمٌ	- শ্রেষ্ঠ, মহান
عِنْدَ	- নিকট, কাছে		

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

أَكْنِي الْقَيْوْمُد

তিনি চিরঝীব, চিরস্থায়ী।

لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে -'Ikl করে না।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে mg^{-1} তাঁরই।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।

وَلَا يُجِيبُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلِيهِ إِلَّا هُمَا شَاءُوا

তিনি যা B"QI করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত করতে পারে না।

وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوُّ بِتِ الْأَرْضِ

তাঁর কুরসি আসমান ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।

وَلَا يَئُودُهُ حَفْظُهُمَا

আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○

আর তিনি অতি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

এ আয়তে আল্লাহ তাআলার পরিচয় অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও ক্ষমতা এ আয়তে -'Iql রূপে ফুটে উঠেছে।

আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র ইলাহ, তিনি ব্যতীত কোনো মাঝুদ নেই। সকল ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাঁর জ্ঞান অসীম, সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তিনি মহান সত্ত্ব। আসমান জমিনের বিশালতা তাঁর কাছে কিছুই না। তিনি ক্লান্তি, নিদ্রা, তন্দুর ইত্যাদির উর্ধ্বে। এককথায় তিনিই সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার, মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

কাজ : আয়াতুল কুরসি পাঠের ফযিলত একটি কাগজে লিখে তা শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখবে।

পাঠ ১২

সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

সুরা হাশর পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সুরা। এ সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ ২২, ২৩ এবং ২৪তম আয়াত নিম্নে অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ফযিলত : এ তিন আয়াতের ফযিলত অত্যন্ত বেশি। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- যে ব্যক্তি সকালে তিনবার

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(উচ্চারণ : আউয়ু বিল্লাহিস সামিইল আলিমি মিনাশ শাহিতানির রাজিম।) পাঠ করার পর সুরা হাশরের শেষ আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্ত্ব হাজার ফেরেশতা নিয়ে করে দেবেন। তাঁরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবে। সোমান সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু লাভ করবে। আর সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি এভাবে পাঠ করবে সেও এ ফযিলত লাভ করবে। (তিরমিয়ি)

শব্দার্থ

هُوَ	- সে, তিনি	الْعَزِيزُ	- পরাক্রমশালী
الَّذِي	- যে, যিনি	الْجَبَارُ	- প্রবল
عَالِمٌ	- জ্ঞানী	الْمُتَكَبِّرُ	- অতি মহিমান্বিত
الْغَيْبِ	- অদৃশ্য	سُبْحَانَ	- পবিত্র, মহান
الشَّهَادَةِ	- দৃশ্যমান, DCW-Z	يُشْرِكُونَ	- তারা শিরক করে, অংশীদার স্থাপন করে।
الرَّحْمَنُ	- দয়াময়	الْخَالِقُ	- সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা
الرَّحِيمُ	- পরম দয়ালু	الْبَارِئُ	- উদ্ভাবনকারী
الْمَلِكُ	- অধিপতি	الْمُصَوِّرُ	- বৃপ্তকার, বৃপ্তদাতা

الْقُدُّوسُ	- পবিত্র	الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى	- b̄iḡm̄ḡn̄
السَّلَمُ	- শান্তি	الْحُسْنِي	- সুন্দর
الْمُؤْمِنُ	- নিরাপত্তা দানকারী	يُسِّيْحُ	- সে তাসবিহ পড়ে, মহিমা ঘোষণা করে
الْمُهَمَّيْنُ	- রক্ষক, রণাবেক্ষণকারী	الْحَكِيمُ	- প্রজ্ঞাময়, প্রজ্ঞাবান

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

১. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَلِيهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ
 هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○
- তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।
 তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।
 তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
২. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الْعَلِيُّ الْقَدُّوسُ السَّلَمُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهَمَّيْنُ
 الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ○
- তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।
 তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি
 তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক,
 তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমাবিত।
 তারা যা কিছু শারিক স্থির করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান।
৩. هُوَ اللَّهُ أَكْلَمُ
 الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ
 لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخَيْفَانِيَّةُ
 يُسِّيْحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
- তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা।
 উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা।
 তাঁর জন্যই রয়েছে উত্তম b̄iḡm̄ḡn̄।
 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা K_2O আছে $\text{mg}^- \text{I} \text{B}$ তাঁর
 পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।
 তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা

এ Avq^lZmgⁿ আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামে C^wi C^v আল্লাহ তাআলার এসব গুণবাচক নাম তাঁর ক্ষমতা ও পরিচয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে। তিনি সর্বশক্তিমান। আসমান জমিন সবকিছুর মালিক। তিনি যা B^zQ^y করেন তাই হয়। তিনি ব্যক্তিত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ। আসমান ও জমিনের সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সুতরাং মানুষের উচিত একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। সর্বাবস্থায় তাঁরই ইবাদত বন্দেগি করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সুরা হাশরের শেষের আয়াত তিনটি মুখ্যস্থ করে অর্থসহ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৩

আল-কুরআন ও নেতৃত্ব শিক্ষা

আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস। নেতৃত্ব ও মানবিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ কিতাব বিশেষ f^ggK^y পালন করে। কুরআন মাজিদ হলো নেতৃত্বার আধার। নীতি-নেতৃত্বার সকল দিকই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নানাভাবে নেতৃত্বার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ পাঠে আমরা নেতৃত্ব শিক্ষা প্রদানে আল-কুরআনের নানা দিকের কথা জানব।

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী। এতে আল্লাহ তাআলার পরিচয়ও বর্ণনা রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার নানা গুণের পরিচয় পাই। যেমন- তিনি করুণাময়, অসীম দয়ালু, ক্ষমাশীল, ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহর , Ymg^fn গুণান্বিত হওয়া আমাদের কর্তব্য।

আল-কুরআন থেকে আমরা এসব গুণের পরিচয় লাভ করব। এরপর আমরা এগুলোর চর্চা করব। ফলে নীতি-নেতৃত্বার দ্বারা আমরা আমাদের চরিত্র সুন্দর করতে পারব।

দুনিয়াতে আগমনকারী নবি-রাসূলগণের বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনে। এতে তাঁদের পরিচয়, তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নবি-রাসূলগণের সফলতা, কৃতিত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছিলেন ||^oW^zIIC| নেতৃত্ব ও মানবিক গুণাবলি তাঁদের চরিত্রের ঝিণ ছিল। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে তারাই সফলতা লাভ করেছে। আর আল-কুরআনের শিক্ষার দ্বারাই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারি।

আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন নবি-রাসূলগণের সর্দার। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সকল গুণের পরিচয় সমন্বয় তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَنْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্রে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সুরা আহ্যাব : ২১)

মহানবি (স.)-এর চরিত্র ও নৈতিকতার কথা কুরআন মাজিদে **‘Urfiye** উল্লেখ করা হয়েছে। একবার উম্মুল মুমিনিন হ্যরত আয়িশা (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর চরিত্র **mashf K** জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- **كَانَ خُلْقَهُ الْقُرْآنِ**

অর্থ : আল-কুরআনই তো তাঁর (রাসুলের) চরিত্র।

অর্থাং আল-কুরআনের **mg**-**I** শিক্ষা ও নৈতিকতাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব শিক্ষা অনুশীলন করে আমরাও প্রিয়নবি (স.) এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার অনুকরণ করতে পারি।

কুরআন মাজিদে **CeH₂ZI** বহু জাতি ও মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যারা তাদের পাপ ও অনৈতিক কাজের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের **mashf K** বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন- আদ জাতি, ছামুদ জাতি, ফেরাউন, নমরুদ, কারুন ইত্যাদি। এসব জাতি ও ব্যক্তিদের বর্ণনা আমাদের অনৈতিকতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয়। অতএব, তারা যেসব অনৈতিক কাজ করত তা থেকে আমরা বিরত থাকব। আর সর্বাবস্থায় নৈতিকতার অনুশীলন করব।

নৈতিক জীবনযাপনের জন্য অনেক নির্দেশনা আল-কুরআনে দেয়া হয়েছে। এগুলো আমাদের নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। নিচে **bH₂Zgj K KtqKU** আয়াত উল্লেখ করা হলো:

فَدُّالْحَ مَنْ زَكَاهَا ۖ وَقُدْخَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۖ ১.

অর্থ : সে-ই সফলকাম হবে যে নিজকে পবিত্র করবে। আর যে নিজকে কল্পিত করবে সেই ব্যর্থ হবে। (সুরা আশ-শামস, আয়াত ৯-১০)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ২.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ৩.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচারের নির্দেশ প্রদান করেন। (সুরা নাহল, আয়াত ৯০)

وَإِنْ تَعْفُواً أَقْرَبُ لِلثَّقَوْيِ ৪.

অর্থ : আর ক্ষমা করে দেওয়াই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩৭)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ৫.

অর্থ : আর তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসা করা হবে। (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩৪)

এভাবে আল-কুরআনের বহু আয়াতে নেতৃত্ব গুণাবলি অনুশীলনের জন্য আদেশ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনেকিক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আমরা অনেকিক তা থেকে বিরত থাকার জন্য **bilagj K** কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَأَيْمَنٌ الْمُسْرِفُونَ ۝

অর্থ : তোমরা খাও ও পান কর। তবে অপচয় করো না। নিচয়ই তিনি (আল্লাহ তাআলা) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা আল-আরাফ, আয়াত ৩১)

وَلَا تُصِيرُ خَلَقَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمِيشُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوَرٍ ۝

অর্থ : অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উন্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিচয় আল্লাহ কোনো উন্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা লুকমান, আয়াত ১৮)

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبْ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهَتُمُوهُ ۝

অর্থ : আর তোমরা একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? **e-Z** তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। (সুরা হুজুরাত, আয়াত ১২)

এছাড়া আরও অনেক আয়াতের দ্বারা মানবজাতিকে নেতৃত্বকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা এসব শিক্ষা জানব এবং নিজেদের জীবনে **ev-ilaqb** করব। ফলে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

কাজ :

- ক. শিক্ষার্থীরা আল-কুরআনের **bilagj K** আয়াত পাঁচটি অর্থসহ একজন অন্যজনের কাছে মুখ্যস্থ বলবে।
- খ. শিক্ষার্থীরা **bilagj K** আয়াত পাঁচটি শিক্ষার্থী পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে একটি কাগজে লিখে রাখবে।

পাঠ ১৪

gbyRlZgj K llZbwU nw` m

মহানবি হয়রত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক। তিনি সর্বদাই মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন। কিসে মানুষের ভালো হবে, কী কাজ করলে মানুষ সফলতা লাভ করবে, তা দেখিয়ে দিতেন। দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের নানা পদ্ধতা তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এর একটি হলো মুনাজাত। তিনি জানতেন আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাজাত করার মাধ্যমে আমরা সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারি। এজন্য তিনি আমাদের বহু মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিসের কিতাবসমূহে **gbyRlZgj K** বহু হাদিস আমরা দেখতে পাই। এ পাঠে আমরা **gbyRlZgj K** তিনটি হাদিস শিখব।

হাদিস-১

اللَّهُمَّ مُصِرِّفُ الْقُلُوبِ صِرِفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

অর্থ : হে আল্লাহ ! হে অন্তরসমূহ ফিরানোর মালিক ! Zig আমাদের অন্তরmgmK তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও । (সহিহ মুসলিম)

হাদিস-২

اللَّهُمَّ ظِهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمِلْي مِنَ الرِّيَاءِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.

অর্থ : হে আল্লাহ ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার চোখকে খিয়ানত থেকে, আর আমার জিহবাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র কর । কেননা চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই অবগত । (বায়হাকি)

হাদিস-৩

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضْيَ بِالْقَدْرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের ওপর সত্ত্বষ্ট থাকার মন মানসিকতা কামনা করি । (বায়হাকি)

উপরোক্ত gjR\Zgj K হাদিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া ও আধিরাতের C\Z কল্যাণ লাভ করতে পারি । অতএব, আমরা অর্থসহ এ মুনাজাতগুলো শিখব । এরপর এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট মুনাজাত করব । তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্বোত্তম সফলতা দান করবেন ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা gjR\Zgj K হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ করে এবং এগুলো দ্বারা নিয়মিত আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবে ।

পাঠ ৫

হাদিস ও নৈতিক শিক্ষা

মানুষের জীবন ও সমাজকে সুন্দর করতে হলে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ অপরিহার্য । উত্তম চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক gj\teila ব্যতীত কোন ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি হতে পারে না । আমাদের প্রিয় নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী । নৈতিকতা ও মানবিক gj\teita জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন । তাঁর নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শ চরিত্রের বিবরণ হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে ।

উভয় চরিত্র ও নেতৃত্ব শিক্ষা দানের জন্য মহানবি (স.)-এর আবির্ভাব। মহানবি (স.) বলেছেন-

إِنَّمَا بُعْثُتْ لِأَقِيمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ -

অর্থ : আমি উভয় চরিত্রের Cii C^ফ Z দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (বায়হাকি)

হাদিসের আলোকে নেতৃত্ব শিক্ষা

পবিত্র কুরআনে নেতৃত্ব অর্জন m^ي K^و i^ه Z বিবরণ আছে। মহানবি (স.)-এর হাদিসেও নেতৃত্ব অর্জন m^ي K^و i^ه Z বিবরণ রয়েছে। কী কী নেতৃত্ব গুণ অর্জন করলে মানবজীবন সুন্দর ও সফল হবে মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিসে এ m^ي K^و যেমন তার বিবরণ রয়েছে তেমনি অনেতৃত্ব কার্যাবলি বর্জনেরও জোর তাগিদ রয়েছে।

সততা, সত্যবাদিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, ক্ষমা, দয়া, পরোপকারিতা, ধৈর্য, আত্মবোধ, সমাজসেবা, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ফুতা, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য এবং শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শুদ্ধি, ছেটদের প্রতি স্নেহ, সহপাঠীদের প্রতি সুন্দর আচরণ ইত্যাদি নেতৃত্ব গুণের বিবরণ হাদিস শরিফে রয়েছে। মহানবি (স.) নিজ জীবনে এসব নেতৃত্ব গুণ ev-^ف evqb করে নিজেকে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব ও আদর্শ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

অন্যদিকে তিনি (মহানবি স.) অনেতৃত্ব আচার আচরণ যেমন- মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গালি দেওয়া, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, অহংকার, অশ্রীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌর্যবৃত্তি, সন্ত্রাস ইত্যাদি বর্জন করার জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং এসবের কুফল ও ক্ষতিকর প্রভাব m^ي K^و তিনি তাঁর হাদিসে gj-^ف evb দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

নেতৃত্ব ও অনেতৃত্ব ম^ي K^و কয়েকটি হাদিস নিম্নে বর্ণিত হলো-

দয়া-মায়া ও সৃষ্টির সেবা m^ي K^و মহানবি বলেছেন-

إِذْ هُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ -

অর্থ: তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হবেন। (তিরমিয়ি)

মহানবি (স.) আরও বলেন- أَلْخُنْ عِيَالَ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخُنْقَى إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ -

অর্থ : সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয় যে তার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করে। (বায়হাকি)

শালীনতা m^ي K^و মহানবি (স.) বলেন- إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذَّارَ

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। (তিরমিয়ি)

আমানত **۠۲۰۱۳** মহানবি (স.) বলেন, **لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَاۤ أَمَانَةَ لَهُ**

অর্থ : যার আমানতদারি নেই তার ইমানও নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দ্রুত আদায়ের তাগিদ দিয়ে মহানবি (স.) বলেন,

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ

অর্থ : শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার **C10** তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

মহানবি (স.) এভাবে অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাকে যেমন জগতবাসীর নিকট **Z4j** ধরেছেন তেমনি অনৈতিকতা ও অসংচরিত থেকেও বেঁচে থাকতে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

الْمُسِلِّمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لَسِانَهُ وَيَدِهُ

অর্থ : সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারি ও মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন- **إِيَّا كُمْ وَاحْسَدْ فِيَّ أَكُلُّ الْحُسَنَاتِ كَمَا تُأْكِلُ النَّارُ الْحَطَبَ**

অর্থ : তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় হিংসা তেমনি **C11** ধ্বংস করে দেয়। (আবু দাউদ)

মহানবি (স.) বলেন- **مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي**

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়। (মুসলিম)

মহানবি (স.) বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর **B7QI** অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। (বায়হাকি)

মহানবি (স.)-এর পবিত্র হাদিস আমরা অধ্যয়ন করে নৈতিকতা ও সংচরিত **۠۲۰۱۴** জানব এবং আমাদের জীবনে তা **eI-eIqb** করব। আবার অনৈতিক কাজ ও অসৎ চরিত্রের দিকগুলো সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস জানব। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব **۠۲۰۱۵** জানব এবং সেসব বর্জন করে চলব। এতে আমাদের জীবন সুন্দর হবে। সবাই আমাদের ভালোবাসবে। আমরা জীবনে সফল হব। পরকালে আমরা মুক্তি ও জান্নাত লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা মহানবি (স.)-এর হাদিসের আলোকে নৈতিক ও অনৈতিক কার্যাবলির তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

Abkxj bgj K cke

ক্ষয়স্থান চৰণ কৰ

১. ইদগাম মোট —— প্ৰকাৰ।
২. আৱেৰ ইয়ামান প্ৰদেশেৰ শাসনকৰ্তাৰ নাম ছিল ——।
৩. Alqwlj Kilm অত্যন্ত —— আয়াত।
৪. —— তো তাৰ (ৱাসুলেৱ) চৰিত্ৰ।
৫. যাৰ আমানতদাৰি নেই তাৰ —— নেই।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশেৰ সাথে মিল কৰ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যে ব্যক্তি প্ৰতাৱণা কৰে	১০৬ তম সুৱা
২. সুৱা হাশৰ পৰিত্ৰ কুৱানেৰ	পাঁচটি
৩. সুৱা কুৱাইশ আল কুৱানেৰ	৫৯তম সুৱা
৪. সুৱা আল ফিলেৱ আয়াত সংখ্যা	আটটি
৫. সুৱা আল যিলযালেৱ আয়াত সংখ্যা	সে আমাৱ উম্মত নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তৰ প্ৰশ্ন

১. নুন সাকিন ও তানবিনেৰ সংক্ষিপ্ত পৱিত্ৰ দাও।
২. সুৱা হাশৰেৱ শেষ তিন আয়াতেৰ প্ৰথম আয়াতটিৰ অৰ্থ লিখো।
৩. gjvRlZgj K তিনিটি হাদিসেৰ যেকোনো একটিৰ অৰ্থসহ ব্যাখ্যা লিখো।

বৰ্ণনাপ্ৰকল্পক প্ৰশ্ন

১. নেতৃত্ব ও আদৰ্শ জীবন গঠনে কুৱানেৰ ভূমিকা বৰ্ণনা কৰ।
২. নেতৃত্ব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰে হাদিসেৰ গুৱৰত্ব বৰ্ণনা কৰ।
৩. সুৱা আল কদৱেৱ অৰ্থ ও শিক্ষা বৰ্ণনা কৰ।

eubelPib cke

1 | B`Mfgi nid KqW?

K. `B

M. Qq

L. Pri

N. ctbtiv|

2 | CVC | A%b||ZK Kv‡Ri Rb” aÝsm Kiv n‡q||Qj Ñ

- i. Av` RmZ‡K
- ii. Qygj RmZ‡K
- iii. eñb BmiñBj ‡K

†KvbiU mWK?

- | | |
|-------------|----------------|
| K. i ii | L. i iii |
| M. ii iii | N. i, ii iii |

ନିଚେର Ab‡”O` ମତ୍ତ ଏବଂ ୩, ୪ ଓ ୫ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦୋଷ

mv` x c\u00f3g i ghv‡bi w` ‡b Ki Avb wZj vI q‡Zi mgq bþ mwKb ev Zibwe‡bi ci ni d Avmtj H bþ mwKb ev Zibwe‡K wgg (ମ) 0iv cwi eZB Kti GK Awjd ,bmn cto| Avi wØZxq i ghv‡b wZj vI q‡Zi mgq wgg mwK‡bi ci ev (ବ) Avmtj H wgg mwKb‡K Pvi Awjd ,bmn cto|

3 | mv` xi c\u00f3g i ghv‡bi wZj vI q‡Z‡K Kx mntmte AvLwqZ Kiv hvq?

- | | |
|----------|-----------|
| K. Bhnvi | L. B` Mwg |
| M. BLdv | N. BKjve |

4 | mv` xi wØZxq i ghv‡bi wZj vI q‡Z Pvi Awjd ,bni -'‡j KZ Awjd cwi gY ,bmn cov DWPZ wQj ?

- | | |
|--------|--------|
| K. GK | L. `B |
| M. wZb | N. cIP |

5 | mv` xi c\u00f3g i ghv‡bi wZj vI q‡Zi Rb” ci Kv‡j cv‡eÑ

- i. ଶାନ୍ତି
- ii. -^w-́
- iii. gy³

†KvbiU mWK ?

- | | |
|------------|----------------|
| K. i | L. ii iii |
| M. i iii | N. i, ii iii |

সংজ্ঞালি প্রশ্ন

- ১। তাসিন ও তাসনিম দুই বন্ধু। তারা উভয়েই রম্যান মাসের শেষ বিশ দিন ইবাদতে ব্রতী হওয়ার সংকল্প করেন। ফলে তাসিন রম্যানের বিশ তারিখ হতে নিকটবর্তী মসজিদে ইতিকাফের মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগিতে রত থাকেন। অপরপক্ষে তাসনিম ইতিকাফে যোগদান না করলেও কুরআন খতম করার মানসিকতা নিয়ে প্রতি রাতে তাড়াতাড়ি ও *A'úÓfite* কুরআন তিলাওয়াত করেন।
- আন্নুর শব্দের অর্থ কী?
 - “আযিযুন আলাইহি” বাক্যটি ইয়হারের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।
 - তাসনিমের কুরআন তিলাওয়াতে শরিয়তের কোন বিধানটি j || NZ হয়েছে? CW'Cý ſ Ki আলোকে ব্যাখ্যা কর।
 - তাসিন রম্যানের শেষ দশ দিনের বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার gj রহস্য সুরা আল-কদরের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। আলম ও সালাম দুই ভাই। আলম সাহেব নিয়মিত নামায আদায় করেন না। তবে তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মানসে বিভিন্ন মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। অপরপক্ষে সালাম সাহেব নিয়মিত নামায আদায়ের পাশাপাশি ছোট ছোট পাপ থেকেও বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।
- ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস কয়টি?
 - “গাফুরুন রাহিমুন” বাক্যটি ইদগামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কর।
 - আলম সাহেবের বিভিন্ন মসজিদে নামায আদায়ের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 - সালাম সাহেবের প্রচেষ্টাটি সুরা যিল্যালের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

PZL[©]Aa[°]q Alj IK (الْحَلْقُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে আখলাক বলে। আখলাক (الْحَلْقُ) আরবি শব্দ ‘খুলুকুন’ (خُلُقٌ) এর বহুবচন। যার অর্থ চরিত্র বা স্বভাব। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রত্যাশা করা যায়, এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- ১। সদাচরণের ধারণা ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা করতে পারবে।
- ২। অসদাচরণের ধারণা ও এগুলো পরিহারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ৩। ঘৃষ্ণ ও চৌর্যবৃত্তির ধারণা ও প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ৪। সন্ত্রাসের ধারণা ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।
- ৫। ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ ১

আখলাকের প্রকার : আখলাক দুই ভাগে বিভক্ত।

১। আখলাকে হামিদাহ (الْحَلْقُ الْحَمِيدَةُ)

মানবজীবনের উত্তম গুণাবলিকে আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্র বলে। যেমন- ধৈর্য, সততা, দেশপ্রেম, সমাজ সেবা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে নন্দিত ও সমানিত।

২। আখলাকে যামিমা (الْحَلْقُ الْيَمِيمَةُ)

মানবজীবনের নিকৃষ্ট চরিত্রকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন- অহংকার, ঘৃণা, মিথ্যাচার, সুদ, ঘৃষ্ণ, অশ্লীলতা প্রভৃতি। এ সকল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

আখলাকের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাকের গুরুত্ব সর্বাধিক। আখলাকই উন্নত জাতির জীবনীশক্তি। যে জাতির চরিত্র যত তালো থাকে, সে জাতি তত শক্তিশালী। যে জাতির চরিত্র ঠিক নেই, সে জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না। সকল নবিই

নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। আর উন্নত চরিত্রকে CYZ। দানের জন্য শেষ নবি হয়েরত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন। মহানবি (স.) বলেন,

بِعْثُتْ لِرِتْمَةِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : “উত্তম চরিত্রকে CYZ। দানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।” (হাকিম)

উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে সুন্দর ও উন্নত করে। আর সমাজের সকল মানুষ চরিত্রবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। অপরদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তি সকলের নিকট ঘৃণিত ও নিন্দনীয়। যার চরিত্র যত উন্নত ধর্মের দিক থেকেও সে তত অগ্রসর।

নবি কারিম (স.) বলেন- **الْيُرْبُّ حُسْنُ الْخُلْقِ**

অর্থ : “উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের gj কথা।” (মুসলিম)

চরিত্র মানুষের fī | চরিত্রবলেই মানুষ সর্বত্র সমাদৃত হয়। ভালো চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি অধিকতর ইমানদার হয়।

মহানবি (স.) বলেন - **أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَسَنُهُمْ حُلْقًا**

অর্থ : “চরিত্রের বিচারে যে লোক উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সেই CYZ ইমানের অধিকারী।” (Alley দাউদ ও দারিমি)

কিয়ামতের দিন পরিমাপদড়ে উত্তম চরিত্রের ওজন হবে অত্যন্ত ভারী।

নবি কারিম (স.) বলেন, “মুমিনের পরিমাপদড়ে কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র অপেক্ষা ভারী জিনিস আর কিছুই নেই।” (তিরমিয়ি)

উত্তম চরিত্র মানুষের পাপকে খণ্ডন করে দেয়। নবি কারিম (স.) বলেন, “উত্তম চরিত্র পাপকে এমনভাবে বিগলিত করে যেমনভাবে সূর্যতাপ বরফকে বিগলিত করে।” (তাবারানি, বায়হাকি)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আখিরাতে তার উত্তম চরিত্রের বিনিময়ে অত্যধিক মর্যাদা লাভ করবে। মহানবি (স.) বলেন, “বাস্দা তার উত্তম চরিত্রের বলে আখিরাতে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানিত স্থানে উন্নীত হবে, যদিও সে ইবাদতের দিক থেকে দুর্বল থাকে।” (তাবারানি)

আমরা উত্তম চরিত্র অর্জন করব। নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করব। আমরা দুনিয়াতে সকলের কাছে প্রিয় হব। পরকালে অশেষ মর্যাদা লাভ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাখে হামিদার (সদাচরণের) সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২

কতিপয় আখলাকে হামিদাহ (﴿الْأَخْلَقُ الْحَمِيدَةُ ﴾) ধৈর্য

ধৈর্য এর আরবি প্রতিশব্দ ‘সবর’ (صَبَرْ)। যার অর্থ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরত রাখা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর বিধান মোতাবেক সকল কর্তব্য পালন করাকে ধৈর্য বলে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধৈর্য বিশ্লেষণ করলে এর তিনটি বিশেষ দিক ॥০ হয়ে ওঠে।

- ১। অবৈধ ও হারাম e-' থেকে নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে বিরত রাখতে ধৈর্যধারণ করতে হয়।
- ২। আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করতে হয়।
- ৩। যেকোনো বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করতে হয়।

তাৎপর্য

ধৈর্য মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। এটি মানবজীবনের সফলতার চাবিকাটি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন কাজ তথাপি সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য তা করা অপরিহার্য। সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণময় জীবনযাপনের জন্য ধৈর্যের (সবরের) গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرٌ هُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ

অর্থ : “অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।” (mj। যুমার, আয়াত -১০)

ধৈর্যের বিপরীত হচ্ছে অধৈর্য। অধৈর্য মানুষকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে জীবনে চলার পথে মানুষকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে।

মানুষের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা ও জয়-পরাজয়। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রয়োজন হয়। বিপদে যেমন সুন্দিনের আশায় ধৈর্যধারণ করতে হয়, তেমনি সুন্দিনে আত্মহারা না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হয়। সুখশান্তি প্রাপ্তিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে, জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ধৈর্যশীল। বিখ্যাত নবি হ্যরত ইবাহিম (আ.) ছিলেন ধৈর্যের gZR প্রতীক। যালিম শাসক নমরুদের gZR। বিরোধিতা করায় তিনি AlMa'āf নিষ্কিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চান নি। এমনিভাবে হ্যরত AlBaqī (আ.) ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর দেহে পচন ধরেছিল। শরীর থেকে গোশত খসে পড়েছিল। আত্মায়ন্ত্রজন তাঁকে ত্যাগ করেছিল। তাঁর সন্তানাদি মারা গিয়েছিল। তাঁর ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমন কঠিন মুহূর্তেও তিনি ধৈর্যহারা হন নি। আমাদের নবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ধৈর্য ছিল অতুলনীয়। তাঁকে হত্যার ঘড়্যন্ত করা হয়েছিল তবু ধৈর্য হারান নি। সকল বিপদেই তিনি ছিলেন অটল ও অবিচল।

শরিয়তের বিধান পালন করতেও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, রময়ান মাসের সিয়াম পালন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হজ $\text{m} \text{ضـ} \text{بـ}$, $\text{m} \text{حـ} \text{جـ}$ । চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্যধারণ করতে হয়।

এমনিভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়জীবনের বিভিন্ন ـ إـتـيـ ধৈর্যধারণের fـيـgـKـIـ LـeـBـ গুরুত্ব CـYـFـ

আমরা সকল বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব। আমরা ধৈর্যশীল হব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ধৈর্যধারণের সুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

আত্ম (أَنْفُسُهُ)

পরিচয়

উৎওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্ম। $\text{CـIـ} \text{ـعـتـ}$ । মধ্যে হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার $\text{m} \text{عـ} \text{كـ}$ আত্ম বলে। মানুষের মাঝে এ হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা বিভিন্নভাবে গড়ে উঠে।

আত্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১। ওরসজাত আত্ম, ২। বিশ্বআত্ম এবং ৩। ইসলামি আত্ম।

ওরসজাত আত্ম

একই পিতার ওরসে বা একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করার কারণে যে আত্ম সৃষ্টি হয় তাকে ওরসজাত আত্ম বলে।

বিশ্বআত্ম

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হ্যারত আদম (আ.) ও আদি মাতা হ্যারত হাওয়া (আ.)। এ কারণে বিশ্বের সকল মানুষই ভাই ভাই। ধীরে ধীরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়া এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবু তারা $\text{CـIـ} \text{ـعـ}$ ভাই ভাই। কারণ তারা সবাই এক আদম (আ.) হতে সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন,

$\text{يـأـيـهـاـ النـاسـ إـلـىـ خـلـقـنـكـمـ مـنـ ذـكـرـ وـأـنـثـيـ وـجـعـلـنـاـ كـمـ شـعـوـبـاـ وـقـبـائـلـ لـتـعـارـفـوـاـ}$

অর্থ : “হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে।” (আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

রাসুল (স.) বলেছেন, “তোমরা প্রতেকেই আদম (আ.) হতে এবং আদম মাটি হতে সৃষ্টি। (বুখারি)
এ আয়াত ও হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষ ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ।

ইসলামি ভাত্ত

আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম, ইসলামের মূলবাণী, আল্লাহ ছাড়া কোনো মারুদ নাই হয়েরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল। যারা এই কালিমায় বিশ্বাসী তারা যে কোনো বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলের অধিকারী হোক না কেন, তারা ইসলামি ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ أَخْوَةٌ

অর্থ : “নিশ্চয়ই মুমিনগণ ভাই ভাই।” (আল-হুজুরাত, আয়াত ১০)

হাদিসে রাসুল (স.) বলেন,

الْمُسِلِمُمْ أَخُو الْمُسِلِمِ

অর্থ: “মুসলমান মুসলমানের ভাই।” (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামি ভাত্তের তাৎপর্য

ইসলামের দ্রষ্টিতে সকল মানুষ সমান। ইসলামে Dīlūl P, সাদা-কালো, ধূমী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর বিশ্বের সকল মুসলমান Ci-Utii ভাই। একই `Xbmfi আবদ্ধ। মহানবি (স.) বলেন, “অনারবগণের ওপর যেমন আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবগণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।” ইসলামি ভাত্ত এতই সুদৃঢ় যে, আল্লাহর রাসুল (স.) পৃথিবীর সকল ইমানদারগণকে একটি দেহের সাথে Zj bv করেছেন। দেহের কোনো একটি অঙ্গে অসুখ হলে যেমন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর কোনো একপ্রাণে একজন মুসলিম বিপদে পতিত হলে সকল মুসলমানের অন্তর ব্যথিত হয়। কোনো মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। এমনটি যদি কখনো Ci-Utii মধ্যে কোনো কলহ সৃষ্টি হয় তখন অপর মুসলমান ভাইয়েরা তা মিটিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। কোনো মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করবে অন্যথায় সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না। প্রিয় নবি (স.) বলেন, “মুমিনগণ Ci-Utii মিলে একটি ইমারতস্বাঁ E, এর এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে।” (বুখারী ও মুসলিম)

আমরা Ci-Utii ভাত্ত বন্ধনে আবদ্ধ থাকব। সুখেদুঃখে একে অপরের সঙ্গে শরিক থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ইসলামি ভাত্তের সুফলগুলো লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৪

নারীর মর্যাদা

পরিচয়

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর আদি পুরুষ হয়রত আদম (আ.) এবং আদি নারী বিবি হাওয়া (আ.)। আর এ দুইজন থেকে পৃথিবীর সকল নর-নারীর সৃষ্টি। ইসলামে নর ও নারী উভয়ের সমমর্যাদা স্বীকৃত। মাতা, কন্যা, ভগী, ৳। প্রত্তি হিসেবে সমাজে নারীদের যে বিশেষ অধিকার ও স্থান রয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করলে নারীর মর্যাদা সমৃদ্ধ হবে।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল করুণ। সেখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হতো। কোনো কোনো সম্প্রদায় কন্যাসন্তানকে জীবিত করব দিত।

কুরআন মাজিদে এ **ঔঝুৰি** হিসেবে- “সেই সমাজের কাউকে তার কন্যাসন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হলে সারাদিন তার মুখ কালো হয়ে থাকত। সে ক্ষুঁক হতো এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করত। এ সুসংবাদের লজ্জার দরুণ অন্য লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে চলত। সে চিন্তা করতো অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে; নাকি মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে; কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করত।” (সুরা নাহল, আয়াত ৫৮)

মহানবি (স.)-এর আবির্ভাবের পর নারী ফিরে পায় পুরুষের সমমর্যাদা। ইসলামে বলা হয়েছে-

أَجْنَبَةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْمَهَاجِتِ

অর্থ : “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।” (নাসায়ি)

নবি কারিম (স.)-এর একটি হাদিসে পিতা অপেক্ষা মায়ের অধিকার বেশি বলে উল্লেখ আছে। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে নারী পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

অর্থ : “নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা একে অপরের অংশ।” (সুরা আলে ইমরান, ১৯৫)

ইসলামে স্বামীর সংসারে ৳। বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ

অর্থ : “তারা (৳।) তোমাদের ফিল আর তোমরা (স্বামীরা) তাদের ফিল। (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৭)

মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ : “নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২২৮)

নারীদের অধিকার $\text{Alム}K$ সচেতন থাকার ব্যাপারে মহানবি (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

অর্থ : “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তাদের গ্রহণ করেছ।” (মুসলিম)

$\text{Alム}E$ লাভের বেলায়ও ইসলাম নারীকে পিতা ও স্বামীর উভয়ের $\text{Alム}E$ অধিকারিণী করেছে। প্রয়োজনীয় বিদ্যুর্জন এবং অর্থ উপার্জনে ইসলাম নারীদের অনুমতি দান করেছে।

আমরা এ পাঠে জানলাম

- ১। নারীর মর্যাদা।
- ২। নারীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে মহানবি (স.)-এর তাগিদ।

আমরা নারীসমাজকে যথাযথ মর্যাদা দেব। তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নারীদের ইসলাম কীভাবে মর্যাদা দিয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

সমাজসেবা (خُلْمَةُ الْمُجْتَمِع)

পরিচয়

সমাজের AlムZ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে স্বেচ্ছায় গৃহীত কাজকে সমাজসেবা বলে। ব্যপক অর্থে মানবকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত সকল $\text{Kgム}PB$ সমাজসেবা নামে পরিচিত।

তাওয়ারিখ

সমাজে নানা শ্রেণি ও পেশার লোক বাস করে। তারা সকলে সমান নয়। তাদের সুযোগ-সুবিধাও সমান নয়। কেউ বিপুল Alムt । অধিকারী আবার কেউ কপর্দকহীন। $\text{Alム}kjy$ ব্যক্তিগণ অভিবী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও তাদের Alム ব্যয় করবে। সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়বে। এটাই ইসলামের নির্দেশ।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلصَّالِحِينَ وَالْمَعْرُومِ ○

অর্থ : “এবং তাদের (ধনীদের) ab-Alムt রয়েছে AfveMöI ও elAtZi হক।” (আল যারিয়াত, আয়াত ১৯)

অর্থশালী ব্যক্তি সমাজের অবহেলিত মানুষের কল্যাণে এমন প্রতিষ্ঠান গড়বে, যে প্রতিষ্ঠানে অভিবী লোকেরা কাজ করে তাদের আর্থিক সমস্যার সুরাহা করবে। বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পাবে। গ্রামের উন্নয়নের বিরাট বাধা $n\#Q$ গ্রামের মানুষের নিরক্ষরতা, অঙ্গতা ও কুসংস্কার। অঙ্গতা ও নিরক্ষরতা একটি বড় অভিশাপ। এসব

বাধা দূর করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাসহ Kj ॥Ygj K প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা mgvRtmevgj K কাজ।

সমাজকে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা Ki Ajb মাজিদে বলেন-

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ : “পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি Kti tqb | ০ (mj । আলাক, আয়াত ১)

হাদিসে বলা হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : “জ্ঞান অব্যেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয” (ইবনে মাজা ও বায়হাকি)

সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা ছাড়া হবে। সমাজ msdklabgj K প্রতিটি কার্যক্রমই সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। সমাজে কোনো ||ek,Lj । বা গোলযোগ সৃষ্টি হলে তা ছাড়া করতে হবে। কারণ ||ek,Lj । সমাজের পরিবেশকে নষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنِ الْقَتْلِ

অর্থ : “ফিত্না (||ek,Lj ।) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা করা, Ci ॥fti । কলহ ও দ্বন্ধ মেটানো সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।” (সুরা আল হুজুরাত, আয়াত ৯)

meOfti । জনগণের উপকারে আসে এমন সব কাজের অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই করা দরকার। যেমন- ভাঙ্গা i ॥ । মেরামত করা, bZb i ॥ । নির্মাণে সাহায্য করা, পুল-সাঁকে নির্মাণ করা, রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা করা, আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসাকেন্দ্রে পোঁছে দেওয়া, i ॥ । পাশে ছায়াদার বৃক্ষ রোপণ করা, বৃক্ষ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

জনসেবা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “আল্লাহ বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।” (মুসলিম)

আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে

سَيِّدُ الْقُوْمِ خَادِمُهُمْ

অর্থ : “জাতির নেতা তিনিই যিনি তাদের সেবক।”

সমাজ সেবা মানবিক দায়িত্ব। আমরা সমাজের সেবা করব। সমাজকে ভালো করে গড়ে তুলব। meOfti । মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। মানব সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সমাজসেবা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে mgvRtmevgj K কাজের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطِينِ)

পরিচয়

জন্মভূমির প্রতি মানুষের অন্তরে একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং ভালোবাসা জন্মায়। ক্রমান্বয়ে এ আকর্ষণ বা ভালোবাসা *we-Z* লাভ করে সমগ্র দেশ, দেশের মাটি ও দেশের জনগনের প্রতি। মাতৃভূমি তথা দেশের প্রতি এ প্রীতি ও দরদের আকর্ষণকেই দেশপ্রেম বলে।

দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশপ্রেমের *għ-B* আছে দেশের খিড়কে ভালোবাসা।

দেশের জনগণকে ভালোবাসা, দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি, ধর্মীয় *għ-Teila*। সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা কর্তব্য।

iżi

দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম দেশপ্রেমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবি (স.) তাঁর *Ribat* মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, মক্কার অধিবাসীদের ভালোবাসতেন। তাদের হিদায়াতের জন্য তিনি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেন। কাফিরদের অত্যাচারে সাহাবিগণকে মহানবি (স.) আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেও তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। পরবর্তীতে কাফিরদের কঠিন ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার দিকে বার বার ফিরে তাকান, আর কাতর কঢ়ে বলেন-

“হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আপন গোত্রীয় লোকেরা যদি ষড়যন্ত্র না করত, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।”

সাহাবিগণও স্বদেশ মক্কাকে খুব ভালোবাসতেন। মদিনায় হিজরতের পর হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত বিলাল (রা.) কঠিন জুরে আক্রান্ত হন। তখন তাঁরা মক্কার তৃণলতা, পাহাড়-পর্বত এবং পানির স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। রাসুলুল্লাহ (স.) সাহাবিগণের এ অবস্থা দেখে বলেন,

“হে আল্লাহ! আমরা মক্কাকে *hi* ভালোবাসি, তদ্দপ অথবা তার চেয়েও অধিকভাবে আপনি আমাদের অন্তরে মদিনার প্রতি ভালোবাসা দান করুন।” (বুখারি)

দেশপ্রেম মানুষকে দেশ রক্ষায় উদ্বৃদ্ধ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক নিজের জানমাল উৎসর্গ করতেও কৃঠাবোধ করে না।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “দেশরক্ষায় একদিন এক রাতের প্রহরা (রিবাত) ক্রমাগত এক মাসের রোয়া এবং সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম।” (মুসলিম)

বলা হয়—

حُبُّ الْوَطَنِ مِنْ أَلِيمَانٍ

অর্থ : “দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।”

দেশপ্রেম মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। দেশের উন্নতিসাধনে সজাগ রাখে। দেশের ম্পু’ সংরক্ষণে উদ্বৃদ্ধ করে।

আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব, দেশের উন্নতি করব। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কীভাবে দেশকে ভালোবাসা যায় তা আলোচনা করবে।

পাঠ ৭

পরমতসহিষ্ণুতা

পরিচয়

পরমত বলতে বুঝায় অপরের মত, পথ বা আদর্শ, সেটা ধর্মীয় হতে পারে এবং আদর্শিকও হতে পারে। আবার রাজনৈতিকও হতে পারে। অন্যের মতামতকে অবজ্ঞা না করে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া বা অন্যের মত বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

অন্যের ধর্মীয় মতামত বা রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল ও সমানজনক মনোভাব পোষণ করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে। পরমতসহিষ্ণুতা মানবচরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ। এ গুণটির কারণেই সমাজে শান্তি, *K;Lj*। ও সমস্তীতি বজায় থাকে। এ গুণটির কারণেই মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে *M^Mle* বজায় থাকে। সৌহার্দ ও *M^MleZi* সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও *M^Mle* বজায় থাকে।

গুরুত্ব

পারিবারিক শান্তি লাভ

একটি সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবনের জন্য পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি এর উপর নির্ভরশীল। পরিবারের অন্য সদস্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা *MnlobfifZi* মনোভাব পোষণ করার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি লাভ করা যায়।

সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

পারিবারিক সুখ-শান্তির মতো সামাজিক সুখ-শান্তি ও পরমতসহিষ্ণুতার ওপর নির্ভরশীল। সমাজে বিভিন্ন মতাদর্শের লোক থাকতে পারে, তাদের সাথে সমরোচ্চা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। তাদের মতের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করলে শান্তি বজায় থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মতামত ও আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাহলেই সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা *Mph*।

রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা

পরমতসহিফুতার ওপর রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলা নির্ভরশীল। একটি দেশে নানা ধর্ম, বর্ণ ও মতের লোক বসবাস করে। তাদের মধ্যে CVI - úwi K †m̄ñv` © m̄púñiZ, mg‡SiZv ও সহাবস্থানের জন্য পরমতসহিফুতা অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা

পরমতসহিফুতার কারণেই আন্তরাষ্ট্রীয় m̄púñiKগুড়ে ওঠে। এর অভাবে CVI - úwi K সহাবস্থান কঠিন হয়ে যায়। আন্তরাষ্ট্রীয় m̄púñiKগুভের প্রধান Cেশ্চির্ত পরমতসহিফুতার আদর্শ। ভিন্ন দেশ ও সমাজের আদর্শ, রীতিনীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকলে আন্তর্জাতিক m̄púñiKঔষধাপন ও CVI - úwi K স্বার্থরক্ষা সম্ভব হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পরমতসহিফুতার সুফলগুলোর একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৮

আখলাকে যামিমা (أَحْلَاقُ ذَمِينَهُ)

পরিচয়

যে খারাপ কাজ বা আচরণ মানুষকে হীন ও নিন্দনীয় করে তোলে তাকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র বলে। যেমন- অহংকার, ঘূষ, অশ্লীলতা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, চৌরবৃত্তি ইত্যাদি।

অপকারিতা

আখলাকে যামিমার কারণে ঐসব ব্যক্তি সমাজ জীবনে নিন্দনীয় হয়। তারা মানুষের ভালোবাসা থেকে eñÁZ হয়। তাদের দ্বারা সমাজের শান্তি-*k;Lj*। বিঘ্নিত হয়। অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রসার ঘটে। তারা আল্লাহ ও রাসুলের অপ্রিয় হয়। পরিকালে জান্নাত থেকে eñÁZ হয়।

তাই আমাদের সকলকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় চরিত্র থেকে `ঝি থাকতে হবে। এর ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, পরিবেশ হবে সুন্দর, মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আখলাকে যামিমার অপকারিতা m̄púñiKঐকটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

অহংকার

পরিচয়

অহংকার শব্দের অর্থ অহমিকা, আমিত্তি, গর্ব, দর্প, দম্ভ, বড়াই, নিজেকে বড় ভাবা ইত্যাদি। নিজেকে অন্যের Zj b̄iq বড় গণ্য করা এবং অন্যকে Zlq নিকৃষ্ট মনে করাকে অহংকার বলা হয়। যে অহংকার করে তাকে অহংকারী বলে। অহংকারী ব্যক্তি বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয় এবং নিজেকে অন্যদের Zj b̄iq উত্তম মনে করে।

অহংকারের কাজ তিনটি

- ১। অঙ্গে অহংকার পোষণ করা।
- ২। চালচলন ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা।
- ৩। কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করা।

মানুষ বংশ, m̄yū` , সৌন্দর্য, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে অহংকার করে থাকে। যেমন ধনী ও m̄yū` kij xi মধ্যে অর্থের গৌরব, ـx̄ij lK̄। মধ্যে সৌন্দর্যের বড়াই এবং ক্ষমতাবানদের মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ, বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার গর্ব ইত্যাদি।

অপকারিতা

অহংকারের কুফল অনেক এবং এর অপকারিতা বর্ণনাতীত। অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এ m̄yū` K̄ মহান আল্লাহর বাণী :

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرْ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ○

“তুমি এ স্থান হতে নেমে যাও। এ স্থানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অধমদের অস্তর্ভুক্ত।” (m̄j। আল আরাফ, আয়াত ১৩)

অহংকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে অপচন্দণীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فُحْشَىٰ فَخُورٍ ○

অর্থ : “নিশ্চয় আল্লাহ কোনো উন্নত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” (সুরা লুকমান, আয়াত ১৮)

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كَبِيرٍ -

অর্থ : “যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম)

প্রতিটি মানুষের কোনো না কোনো অভাব আছে। সুতরাং অহংকার করা তার জন্য শোভা পায় না। অহংকার শুধু তাঁরই শোভা পায়, যার কোনো অভাব নেই। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

“আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অহংকার আমার $f+V|0$ (মুসলিম)

আমরা অহংকার বর্জন করব। কেননা মানুষের কোনো জিনিস নিয়েই অহংকার করার অবকাশ নেই।

আমরা এ পাঠে শিখলাম, অহংকার পতনের মূল। অহংকারী অভিশপ্ত। আমরা অহংকার করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কী কী কাজ করলে অহংকার করা হয় এর একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১০

অশ্লীলতা

পরিচয়

অশ্লীলতা অর্থ জগ্ন্যতা, কদর্যতা, নির্জনতা, অভদ্রতা ও ঘোন বিষয়ক কৃৎসিত আচরণ। অশ্লীলতার দ্বারা নির্জন ও কুরুচিপূর্ণ কথা ও কাজকে বুঝানো হয়। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতাসহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলোকেও অশ্লীল বলা হয়।

কুফল

অশ্লীলতা একটি বড় অপরাধ। এটা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। সমাজকে কল্পিত করে। $W^{\circ}WC$ ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র হনন করে যুবক-যুবতীদের কু Ktg° প্রতি প্রনুর্ধ করে।

আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

“বলুন, আমার প্রতিপালক নিয়িন্দ্র করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।” (আল আরাফ, আয়াত ৩৩)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

“প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।” (আল আনআম, আয়াত ১৫১)

অশ্লীল আচরণকারী সকলের নিকট ঘৃণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

“যার মধ্যে অশ্লীলতা আছে, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে। আর যার মধ্যে লজ্জাশীলতা আছে, তা তাকে সৌন্দর্যমত্তিত করে।” (তিরমিয়ি)

অশ্লীলতা মানুষের পারলোকিক জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

أَبْيَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاجِشِ أَنْ يَدْخُلَهَا

অর্থ : “প্রত্যেক অশ্লীল আচরণকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম।” (কানযুল উমাল)

অশ্লীলতা ত্যাগ করা মুমিন বান্দার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْفَوَاحِشَ

অর্থ : “তারাই (মুমিন) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে ।” (সুরা আস-শূরা, আয়াত ৩৭)

প্রতিকার

১. ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুশীলন,
২. পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং
৩. সচেতনতার পাশাপাশি আইনি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক *Kuafi* ব্যবস্থা করা।

অশ্লীল কথা, কর্ম ও অপরাধকে সবাই ঘৃণা করে। অশ্লীলতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার প্রতীক। অশ্লীল আচরণ ও কর্ম থেকে আমরা বিরত থাকব, অন্যকেও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অশ্লীলতার প্রতিকার *Mas'it K Abi'0* লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১১

পরশ্রীকাতরতা (سُلْطَان)

পরশ্রীকাতরতা অর্থ অন্যের উন্নতি ও সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষ্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ কারো ধন-দৌলত, সম্মান, ভালো ফল বা *D"p* মর্যাদা দেখে ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া এবং তার ধ্বংস কামনা করাকে পরশ্রীকাতরতা বলা হয়।

কুফল

পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন শত্রুতা, অহংকার, নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলো হারাম ঘোষণা করেছে। পরশ্রীকাতরতার অপকারিতা সীমাহীন। হয়রত আদম (আ.)-এর পদমর্যাদা দেখে ইব্লিস তার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়। ফলে সে অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহ তাআলার দয়া থেকে *ewâz* হয়।

মানব সৃষ্টির পর ঈর্ষার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল পরশ্রীকাতরতার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। পরশ্রীকাতরতা মানুষের *CIV* কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ *Mas'it K* মহানবি (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْخَسَدَ يَا كُلُّ الْخَسَدَاتِ كَمَا تُكْلُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ : “আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয় পরশ্রীকাতরতা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়।” (মুসনাদি শিহাব)

পরশ্রীকাতরতা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। পরশ্রীকাতরতা সমাজে বাগড়া-ফাসাদ, মারামারি ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে পরশ্রীকাতরতা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

○ حَسْنٌ إِذَا حَسِّنْتُمْ وَمُنْ شَرٌّ حَاسِّنْتُمْ

অর্থ : “আর হিংসুকের (পরশ্রীকাতরতার) অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।” (mj। ফালাক, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জান্নাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি (স.) একবার তার এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ $m\mu\ddot{u}K$ জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি (সাহাবি) বলেন আল্লাহ তায়ালা যাকে কোনো উত্তম E' দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা

আমরা পরশ্রীকাতর হব না। নিজের পতন নিজে ডেকে আনব না। হিংসা করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পরশ্রীকাতরতার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষের বোর্টে ঝুলিয়ে দেবে।

পাঠ ১২

ঘৃণা (البغض)

পরিচয়

ঘৃণা অর্থ অবজ্ঞা, অপচন্দ, উপেক্ষা, $ZW'Qj$, ZlQ জ্ঞান করা। কাউকে ZlQ মনে করে তাকে সহ্য করতে না পারা এবং তার থেকে দূরে সরে থাকাকেই পরিভাষায় ঘৃণা বলে।

অহংকার, শত্রুতা, পদমর্যাদার লিঙ্গা প্রভৃতি কারণে ঘৃণার উদ্দেক ঘটে। ঘৃণা করা অন্যায় তবে ক্ষেত্রবিশেষ ঘৃণা একটি মানবীয় গুণ। যেমন মন্দ কাজে ঘৃণা করা প্রশংসনীয়। সমাজে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সুদ, দুষ, মদ, জুয়া, অশীলতা, বেহায়াপনা, হেরোইন সেবন ইত্যাদি ঘৃণিত কাজ। এগুলোকে ঘৃণা করা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। তবে মনে রাখতে হবে পাপ কাজকে ঘৃণা করব পাপীকে নয়।

কুফল

অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা একটি মহা গুরুতর ব্যাধি। এতে eUtZi মধ্যে ফাটল ধরে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। ঘৃণাকারী কখনো মনে শান্তি লাভ করতে পারে না। এতে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষতি সাধিত হয়।

মহানবি (স.) বলেন, **دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمِّمِ قَبْلَكُمْ أَخْسَدُ وَالْبَغْضَاءُ**

অর্থ: “পূর্ববর্তী উম্মাতের দুটি রোগ তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, হিংসা এবং ঘৃণা।” (বায়হাকি)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, “তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের ক্ষতি করার জন্য কৌশল করো না বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে Ci-Uj ভাই ভাই হয়ে যাও।” (বুখারি ও মুসলিম)

ঘৃণা বা তাচ্ছল্য শয়তানের বৈশিষ্ট্য। শয়তান হ্যরত আদম (আ.)-এর প্রতি ZW'0j করার কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে। আমরা কাউকে ঘৃণা করব না।

আমরা ঘৃণার কুফল উপলব্ধি করব। সকলের প্রতি উদার হব। ভালো কাজে প্রশংসা করব। অর্থ, বিদ্যা বা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিতে কাউকে ঘৃণা বা হেয় করব না। তবে মন্দ কাজকে ঘৃণা করব। মন্দ কাজকে ঘৃণা না করলে সমাজে তা ধীরে ধীরে বৈধ বলে পরিগণিত হয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘৃণার কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩

চৌর্যবৃত্তি

পরিচয়

চৌর্য অর্থ অপহরণ, Pihi | চৌর্যবৃত্তি অর্থ চোরের ব্যবসায় বা পেশা অথবা চোরের কাজ। কারো gwjj Kvbfif'ও ॥ঘূঁঁ॥ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে হাতিয়ে নেয়ার নাম চুরি বা চৌর্য।

চুরির কুফল

নিরাপত্তাহীনতা :

চুরির জন্য ॥ঘূঁঁ॥ ও জীবন নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। কারণ কখনো কখনো চোর ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মালিককে খুনও করে।

সামাজিক শান্তি বিনষ্টি :

চৌর্যবৃত্তির কারণে মানুষ শাস্তিতে ঘুমুতে পারে না। ॥ঘূঁঁ॥ পাহারা দিতে নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়। সর্বদা ॥ঘূঁঁ॥ চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সামাজিক শান্তি ও ॥ঘূঁঁ॥ বিনষ্ট হয়।

সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি :

চুরির দ্বারা সমাজে আরও নতুন নতুন অপরাধ সৃষ্টি হয়। চোর শুধু তার কাজ চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না বরং সে চুরি, ছিনতাই, অপহরণ, খুন এবং মাঝে মাঝে সম্মহনির ঘটনাও ঘটায়।

চৌর্যবৃত্তি একটি ঘৃণিত কাজ :

সমাজের নিন্দনীয় কাজগুলোর অন্যতম চৌর্যবৃত্তি। সমাজে চোরকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। চোরকে মানুষ আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। পরিবার ও সমাজের লোকেরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

পরকালীন শার্ি :

চুরি একটি অত্যন্ত জঘন্য ধরনের নিষিদ্ধ কাজ। এর ফলে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন থাকতে পারে না। আল্লাহ তার জন্য পরকালেও ভয়াবহ **KW-Í**। অঙ্গীকার করেছেন।

চুরি প্রতিরোধে ইসলামের ভমিকা :

চুরির জন্য পরকালে **KW-Í** অঙ্গীকার ছাড়াও এ অনেতিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধানও দিয়েছেন।

প্রতিকার:

১। মৌলিক প্রয়োজন মেটানো

কেউ যাতে অন্য, দ্রোণ বা মৌলিক চাহিদার অভাবে চুরি না করে তার জন্য সেসবের ব্যবস্থা করতে হবে। তার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

২। দৃষ্টিত্বমূলক **KW-Í** ব্যবস্থা

অভাব না থাকা সত্ত্বেও স্বত্বাবগত কারণে কেউ যদি চুরি করে তাহলে সব দেশ এবং সব সমাজেই সেজন্য **KW-Í** বিধান রয়েছে, ইসলাম ধর্মেও তার জন্য কঠিন **KW-Í** বিধান রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً إِيمَانًا كَسْبًا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ

অর্থ : “পুরুষ চোর আর মহিলা চোর তাদের হাত কেটে দাও। তারা যা করেছে এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার দৃষ্টিত্বমূলক **KW-Í**।” (**mj**। মাযিদা, আয়াত ৩৮)

৩। নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত্করণ

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে চৌর্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। চোরকে সামাজিকভাবে বয়ক্ট করার মাধ্যমে নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত করা।

ধর্মীয় প্রতিকার

চুরি শুধু সামাজিক অপরাধই নয়, ধর্মীয় বিবেচনায় একটি হারাম কাজ। দুনিয়ায় ঘৃণা ও **KW-Í** ছাড়াও আখিরাতে এর জন্য কঠোর **KW-Í** বিধান রয়েছে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে চৌর্যবৃত্তির প্রতিকারের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

ঘুষ (أَلْرِشُوْةُ)

পরিচয়

ঘুষ অর্থ উৎকোচ। এর আরবি প্রতিশব্দ ‘রেশওয়াত’। অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিকই ঘুষ। কর্তব্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে উপটোকন গ্রহণ করাও ঘুষ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল, আর এ সুপারিশের প্রতিদানস্বরূপ তাকে কিছু উপহার দেওয়া হলে, সে যদি তা গ্রহণ করে, তবে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজায় উপস্থিত হবে।” (কিতাবুল কাবায়ির)

কুফল

ঘুষ একটি সামাজিক অপরাধ। ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। ঘুষ গ্রহীতাকে সকলে ঘৃণা করে। ঘুষ গ্রহণ এবং দেওয়া দুটিই পাপ কাজ। ঘুষ গ্রহীতা ও দাতার ওপর আলাহ তাআলার অভিশাপ বর্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاِشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ -

অর্থ: “ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার ওপর আলাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।” (ইব্ন মাজাহ)

ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই অমার্জনীয় অপরাধ। ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহানামি। রাসুল (স.) বলেন,

الرَّاِشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ كَلَّاهُمَا فِي النَّارِ -

অর্থ : “ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহানামি।” (তাবারানি)

কোনো কর্মচারী তার বেতনের অতিরিক্ত জনগণ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা অবৈধ। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, “কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা কোনো কাজে নিয়োগ করি এবং এ জন্য তাকে বিনিময় দান করি, আর সে বিনিময়ের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা খিয়ানত হিসাবে গণ্য হবে।” (আবু দাউদ)

ঘুষ প্রতিরোধে ইসলামি বিধান

ইসলাম ঘুষকে হারাম ঘোষণা করেছে। মুমিনদের ঘুষ আদান প্রদান না করার বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ ঘুষের সম্পদকে হারাম ও অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। মুমিনদের দায়িত্ব হলো এ নিষিদ্ধ অপবিত্র কাজে অংশগ্রহণ না করা।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী,

“বলুন মুহাম্মদ (স.)। হারাম ও অপবিত্র জীবিকা এবং পবিত্র জীবিকা সমান নয়। যদিও হারামের আধিক্য তোমাদের বিস্মিত করে। কাজেই হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর।” (সুরা মায়দা, আয়াত ১০০)

কিয়ামত দিবসে ঘূষ গ্রহীতার পরিণতি হবে খুবই লজ্জাজনক। মহানবি (স.) বলেছেন- “যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! ব্যক্তি যা ঘূষ হিসেবে গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়েই উপস্থিত হবে।”

সর্বোপরি মহানবি (স.) ঘূষদাতা ও গ্রহীতার জন্য জাহানামের সংবাদ দিয়েছেন।

আমরা সমাজকে ঘূষের অভিশাপ থেকে মুক্ত করব। নিজেরা কখনো ঘূষ আদান-প্রদান করব না।

সামাজিক অপরাধ হিসাবে এ অভিশপ্ত কাজ প্রতিরোধ করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ঘূষের সামাজিক কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৫

সন্ত্রাস

পরিচয়

সন্ত্রাস হলো ফিতনা-ফাসাদের আধুনিক রূপ। সন্ত্রাস শব্দের অর্থ অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ। অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে বা জোর খাটিয়ে মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা বা আদায়ের পরিবেশ সৃষ্টির নীতিকে সন্ত্রাস বলে।

সন্ত্রাসের কুফল

সন্ত্রাসের ফলে সমাজে *Wk;Lj*। সৃষ্টি হয়। সামাজিক জীবন *Wech[©]* হয়। মানুষের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন ব্যাহত হয়। সন্ত্রাস কবলিত জনপদে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। যখন তখন কেউ অপম্রত্যুর শিকার হতে পারে। সন্ত্রাসের কারণে মানুষের *mþúf*। নিরাপত্তা থাকে না। সন্ত্রাসের নিরাপত্তা থাকে না। *Cv i - úwi K mþúf* ক্ষেষ্ট হয়। বিদ্রোহ বেড়ে যায়। *AiBb-k;Lj*। ও প্রশাসন স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের বিধান

ইসলাম সন্ত্রাস প্রতিরোধে মুসলমানদের ঐক্যবন্ধ থেকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। আর এ যুদ্ধকে মুমিনদের ইমান রক্ষার যুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর বাণী,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

অর্থ : “আর কাফির ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। যতক্ষণ না ফিতনা-বিশৃঙ্খলা *lbqf* হয়।” (*mj*। আনফাল, আয়াত ৩৯)

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম সাধারণত তিন প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছে।

১. *Kw̄ Igj K ēē'॥*

সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অপচন্দ করেন। মহান আল্লাহ সন্ত্রাসকে হত্যার চেয়ে জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থ: “আর ফিতনা (বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস) হত্যার চেয়ে জঘন্য।” (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯১)

যারা আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞার পরও *Wek;Lj* ॥, *Wech* বা সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখবে, তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা *Kw̄ Igj K* ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধর্মসন্ধানক কাজ করে বেড়ায় এটাই তাদের *Kw̄ I* যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা *Kfj* বিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের *j AlAbi* Ges পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে *gnvKw̄ I* । ০ (*mj* । মায়িদা, আয়াত ৩৩)

২. কারণ উদ্ঘাটন ও নিরসন

ইসলাম সন্ত্রাসের কারণ উদ্ঘাটন ও তা নিরসনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ জন্য ইসলামে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও নেতৃত্ব অবক্ষয় রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দিয়েছে।

৩. নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত্করণ

জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামি বিধান কার্যকর করে নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত করে সন্ত্রাস দূর করা যায়।

নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সন্ত্রাসী কাজকে ঘৃণা করা এবং সন্ত্রাসীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার মাধ্যমে নেতৃত্বাবোধ জাগ্রত করা যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সন্ত্রাসের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে এবং শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ১৬

এইচআইভি এবং এইডস

বর্তমান শতাব্দীর এক মহাআতঙ্কের নাম এইডস। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগেও এইডস বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। এ রোগটি ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে ধরা পড়ে। যে ভাইরাস থেকে এ রোগটি হয় তার নাম Human Immune Deficiency Virus, এর সংক্ষিপ্ত নাম HIV- এটি একটি ঘাতক ব্যাধি। HIV দ্বারা কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে তাকে “এইচআইভি বহনকারী” হিসেবে চিহ্নিত Y করা হয়। এ ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে রক্তের রোগ প্রতিরোধকারী T4 কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এক পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে *gZii* কোলে ঢলে পড়ে।

এইচআইভি যেভাবে ছড়ায়

বয়স, জাতি, লিঙ্গ, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই এইচআইভি দ্বারা সমানভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এইচআইভি মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের তরল পদার্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। তরল পদার্থগুলো হলো রক্ত, বীর্য, মাত্তুগ্রহ ইত্যাদি। যদি এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষ বা মহিলার শরীরের তরল পদার্থ কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে, তবে তিনি এইচআইভি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।

এইচআইভি এবং এইডস যেসব কারণে ছড়ায় তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো—

- (ক) অবৈধ যৌন আচরণ
- (খ) মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সিরিজের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো
- (স.) অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো

চিকিৎসা দর্শন

- ১। সুস্থ বৈবাহিক জীবনযাপণ করা।
- ২। নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা এড়িয়ে চলা।
- ৩। মাদক ও নেশা জাতীয় সকল জিনিস বর্জন করা।
- ৪। অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ না করানো।

আমরা ইসলামি বিধিবিধান মেনে চলব। সামাজিক অপরাধসমূহ এড়িয়ে চলব। আমরা নিজেকে এবং সমাজকে সকল অপরাধ ও রোগসংক্রমণ থেকে রক্ষা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

Abjxij bgj K cökæ

ক্ষয়স্থান রেণ কর

১. সন্তানের বেহেশত —— পদতলে।
২. ধৈর্য মানবজীবনের একটি —— |
৩. —— একটি বড় অভিশাপ।
৪. জাতির নেতা তিনিই যিনি তাদের —— |
৫. যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে সে —— প্রবেশ করবে না।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আল্লাহ কোনো উদ্ধৃত অহংকারীকে	মানসিক ব্যাধি
২. অশ্লীল আচরণকারী	গুরুতর
৩. পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক	ভাই ভাই
৪. ফিত্না (Fikr; Lj) হত্যা অপেক্ষা	সকলের নিকট ঘৃণিত
৫. নিশ্চয়ই মুমিনগণ	পছন্দ করেন না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সদাচরণ বলতে কী বুঝা?
২. দেশপ্রেম বলতে কী বুঝায়?
৩. অশ্লীলতা কী? সংক্ষেপে লিখো।

eYbgj K cökæ

১. ইসলামের দৃষ্টিতে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।
২. ইসলামে নারীর মর্যাদা maf'at Kবর্ণনা দাও।
৩. সন্ত্রাস কার্যক্রম প্রতিকারের উপায় কী? বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1 | াvZzjK Kq fvM fM Ki v hq?

K. `B

M. CIP

L. WZb

N. mvZ |

2 | mgvRtmevi A^of^g ntj vN

- i. mvgwRK wbivcEv রক্ষা
 - ii. ci-útii i ØØ tgUitbv
 - iii. mñtobtK lkñkñv `wb|

†KvbU mWK ?

নিচের Abf "Q" । U পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

শাহরিয়ার সাহেব একজন বড় কর্মকর্তা। তিনি সহকর্মীদের ছোট ছোট ভুলের কারণে অশীল ভাষা ব্যবহার করেন।

৩। শাহরিয়ার সাহেবের কাজটি কিসের প্রতীক?

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| K. Nyvi | L. AnsKv <i>t</i> i |
| M. Ab <i>v</i> q <i>i</i> | N. Amf <i>Z</i> vi |

৪ | শাহরিয়ার সাহেবের কাজের ফলে-

- i. RvbñZ nvi^g n^te
 - ii. ci t^j ŠKK Rxeb `t^mn n^te
 - iii. mK^tj i wbKU NñYZ n^te |

tKvbWJ mWK?

- | | |
|--------|----------------|
| K. i | L. ii iii |
| M. iii | N. i, ii iii |

সুজনশীল প্রশ্ন

1 | i vqnib mvtne K· evRv̄t̄i i GKRb weikó w̄kP̄bj̄w̄x | mgvR̄t̄meK| wZ̄lb GKU temi Kwi
wekje` vj tqi cwi Pvj K| D³ wekje` vj qmUtz wb̄tqM weÁw̄B cK̄wkZ nt̄j i vqnib mvtnei eÜz
AveÝm mvtnei - ; x cfvLK ct̄` Ave` b Kt̄ib| ct̄i i vqnib mvtnei Abt̄iavutq AveÝm

মুঠন্টেই জ্ঞ D³ চ্ছ` ন্বত্তেজ্জ্ব কিংজ আব্যম মুঠন্টেই এব্যম ন্বরি ন্তেক
KZÁZv চক্র ক্ষিব গেস GKU প্রাপ্ত প্রস্তুত গ্রন্থ ক্ষেত্র মন্ত্র দেশ ক্ষিব |
GK` এ ব্যন্তেই তাউ তগ্নি এব্যে আব্যে ব্যে তেওয়ে গ্রাম ব্য এজ দ³ ক্ষেত্র মন্ত্র হ্ব

- K. নহি Z আ` g (Av.)-Gi গ্রহণ ক্ষেত্র ক্ষেত্র ন্বত্তেক ?
- L. ন্বস্মী গ্রাম মুগ্রাম ক্ষেজ এব্যে কি |
- M. ব্যন্তেই মন্ত্র ক্ষেত্র আব্যে ক্ষেত্র হ্বগ্রন্থ ক্ষেত্র ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত? ক্ষেত্র এব্যে আব্যে ক্ষেত্র এব্যে কি |
- N. আব্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্র এব্যে বিশেষণ কি |

2|



ৰP¹ bs 1: ব্য ম্ব ন্বজ মোগ্রেম্ব ক্ষেজ |
1 Rj ব্য, 2012 ক্ষেজ আব্যে |

- K. ব্যে প্রে ক্ষেজ ন্বজ ক্ষেক ক্ষেত্র ক্ষেজ ক্ষেজ ক্ষেজ ?
- L. ব্যে ক্ষেজ ক্ষেজ এব্যে এজ ক্ষেজ এব্যে ক্ষেজ |
- M. 1 bs ক্ষেজ মোগ্র এব্যে এজ ক্ষেজ ক্ষেজ ক্ষেজ ক্ষেজ ক্ষেজ ? এব্যে কি |
- N. 2 bs ক্ষেজ ক্ষেজ এব্যে এজ ক্ষেজ ক্ষেজ ক্ষেজ এব্যে এব্যে ক্ষেজ ক্ষেজ ক্ষেজ |

cÂg Aa"iq আদর্শ জীবনচরিত

মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির gj উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর বিধিনিময়ে মান্য করা। আর এসব বিধিনিময়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অবশ্যই একটি অনুসরণীয় নীতিমালা প্রয়োজন। যাকে আমরা আদর্শ বলতে পারি। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত নবিগণের জীবনচরিত আমাদের আদর্শ। এর মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবন চরিত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এমনিভাবে যারা নবি ও রাসূলগণের জীবনী অনুকরণ করে ধন্য হয়েছেন তাদের জীবনের ভালো দিকগুলোকেও আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব।

এ অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী-

- আদর্শ জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কতিপয় মনীষীর জীবন চরিত বর্ণনা করতে পারবে।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন, সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক gj "fela, ভাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অপসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায় বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও gj "iqb করতে পারবে।
- ej-Íe জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনে উদ্বৃন্দ হবে।
- দলগতকাজে গণতান্ত্রিক gj "fela রক্ষা করতে পারবে এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানে আগ্রহী হতে পারবে।

পাঠ ১

হযরত সুলাইমান (আ.)

পরিচয়

হযরত সুলাইমান (আ.) আল্লাহর প্রসিদ্ধ নবি ছিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ ৭০-৯৭৫-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। যে চারজন বাদশা mg-Í পৃথিবীর শাসক ছিলেন হযরত সুলাইমান (আ.) তাদের একজন। তিনি পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.) ইস্তিকাল করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আ.)-কে নবি হিসেবে হযরত দাউদ (আ.) -এর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং mg-Í পৃথিবীর রাজত্ব দান করেন।

অলৌকিক ক্ষমতা লাভ

নবি হিসেবে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদা ছিল। আল্লাহ তাঁকে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, জীব-জন্ম ও জ্বিন-ইনসানের ভাষা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“সে (সুলাইমান) বলল : হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু (জ্ঞান) দেওয়া হয়েছে। নিচ্যই এটা *mīyū* অনুগ্রহ। (সুরা নামল, আয়াত ১৬)

তিনি ছিলেন সুবিশাল *līlā*-*īlā* রাজ্যের রাজা। শাসনকার্য সুষ্ঠু ও সুচারূপে *mīyū* করার জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। খুব দ্রুত যাতায়াত করার জন্য মহান আল্লাহ তাকে বাতাসে ভর করে চলাচল করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। তাঁর যখন যে স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন হত তিনি বাতাসকে আদেশ করলে বাতাস তাঁকে তাঁর বিশাল সিংহসন ও গোকবলসহ *gīfz* স্থানে পৌছে দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِسْلِيَّمَانَ الْرَّجِيعُ غُلْوَهَا شَهْرٍ وَرَاحَهَا شَهْرٍ

অর্থ : “আমি বায়ুকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম। সে সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত ও সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (সুরা সাবা, আয়াত ১২)

আল্লাহ তাআলা জিনদের মধ্য হতে একদলকে হ্যরত সুলাইমান (আ.)-এর অধীন করে দিলেন। তারা হ্যরত সুলাইমানের জন্য সমুদ্র হতে মুক্তা সংগ্রহ করে আনত। এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করত। যেমন, *mīdā* প্রাসাদ, *tārīq* ন্যায় বড় পেয়ালা ইত্যাদি নির্মাণ করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالشَّيَّاطِينَ كُلَّ بَنَىٰ وَغَوَّاصِ

“এবং (আমি অনুগত করে দিলাম) শয়তানদের, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদনির্মাণকারী ও ডুরুরি।” (সুরা সাদ, আয়াত ৩৭)

তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে গোয়েন্দার কাজ করতে আল্লাহ পাক তাঁকে ‘হুদুহুদ’ নামক একটি পাখি দিয়েছেন। সে পাখিটি তাঁকে রানি বিলকিস ও তার রাজত্বের সংবাদ দিয়েছে। এ সবই তাঁর অলৌকিক শক্তির নির্দর্শন।

বিচার শক্তি

হ্যরত সুলাইমান (আ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আল্লাহ তাআলা তাকে খুব *mīkāb* বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি খুব বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন।

একদা দুজন নারী একটি শিশুর মাতৃত্ব দাবি করল। এর মীমাংসা করার জন্য তারা হ্যরত দাউদ (আ.)-এর নিকট এলো। সেখানে হ্যরত সুলাইমান (আ.) ও উপস্থিত ছিলেন। হ্যরত সুলাইমান (আ.) বললেন শিশু হলো একটি অর্থচ দাবিদার দুজন। তাহলে শিশুটি কেটে দুভাগ করে দুজনকে দিয়ে দেওয়া হোক। একথা বলে হ্যরত সুলাইমান (আ.) একটি ছুরি হাতে নিলেন। শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দু'ভাগ করার জন্য উদ্ধৃত হলেন। তখনই একজন নারী কাঁদতে কাঁদতে বললেন। আল্লাহর দোহাই! শিশুটিকে কাটবেন না আমি আমার দাবি ত্যাগ করলাম। শিশুটিকে জীবিত রাখুন এবং তাকে অপরজনের নিকট দিয়ে দিন। হ্যরত সুলাইমান (আ.) বুবলেন এ নারীই শিশুটির প্রকৃত মাতা। তখন তিনি তাকে শিশুটি দিয়ে দিলেন এবং অন্যজনকে মিথ্যা বলার দায়ে *kwā* দিলেন।

বালক বয়সে হ্যারত সুলাইমান (আ.)-এর আরও একটি ঘটনা হলো— একদা দুজন লোক হ্যারত দাউদ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিচারপ্রার্থী হলো। তাদের একজন ছিল রাখাল অপরজন কৃষক। কৃষক তথা শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগলের রাখালের বিবুদ্ধে অভিযোগ করল যে, রাখালের ছাগল রাতে ছাড়া পেয়ে তার mg^{-1} ফসল বিনষ্ট করে ফেলেছে। সত্যতা যাচাই করার পর হ্যারত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগলের মালিক তার mg^{-1} ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। মামলার বাদী-বিবাদী উভয়ে রায় শুনে দরবার হতে যাওয়ার পথে হ্যারত সুলাইমান (আ.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি সব শুনে বললেন-আমি রায় দিলে তা ভিন্ন হতো উভয় পক্ষের উপকার হতো। হ্যারত সুলাইমান (আ.) তাঁর পিতার নিকট তা ব্যক্ত করার পর তাঁর পিতা বললেন এর চাইতে উভয় রায় কী হতে পারে? হ্যারত সুলাইমান (আ.) বললেন আপনি mg^{-1} ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম দ্বারা উপকৃত হোক। আর শস্যক্ষেত্র ছাগলের মালিকের নিকট অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপাদন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগলে বিনষ্ট করার ক্ষেত্রস্থায় ফিরে যাবে তখন তা তার মালিককে বুবিয়ে দেবে। হ্যারত দাউদ (আ.) এ রায় পছন্দ করলেন এবং তা কার্যকর করতে বললেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَفَهَنَّا هَامْلَيَا حُكْمًا وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلِمَّا ز

“এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুবিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।” (সুরা আস্মিয়া, আয়াত ৭১)

বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ

হ্যারত সুলাইমান (আ.)-এর পিতা হ্যারত দাউদ (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার আগে ইস্তিকাল করেন। ইস্তিকালের আগে তিনি দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমার সন্তানের দ্বারা তা নির্মাণ করাও। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। জেরুজালেম ক্ষমতা গ্রহণ করে হ্যারত সুলাইমান (আ.) বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজ শুরু করেন। এ মসজিদ নির্মাণে ৩০ হাজার শ্রমিকের ৭ বছর সময় লেগেছিল বলে কথিত আছে। gj Z জিন জাতিরাই এ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেছিল।

রাজত্বকাল ও ইস্তিকাল

হ্যারত সুলাইমান (আ.) ৪০ বছর নবৃত্তি দায়িত্ব পালন করেন এবং সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব করেন। তার শাসনকাল ছিল খ্রিস্ট^{CE} ৯৬০-৯২০ সাল পর্যন্ত। তাঁর ইস্তিকালের ঘটনা বিস্ময়কর। বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা ছিল অবাধ্য একদল জিন। তারা হ্যারত সুলাইমান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। কিন্তু তাঁর ইস্তিকালের আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হবে না আর তাঁর ইস্তিকালের সংবাদ জানলে জিনরাও কাজ করবে না। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাস Am^WY^Wথেকে যাবে। তাই হ্যারত সুলাইমান (আ.) DTMZ এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশে ব্যবস্থা নিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য C⁰' Z হয়ে তাঁর sw^Q কাচের নির্মিত মেহরাবে (বিশেষ কক্ষে) প্রবেশ করলেন। তিনি নিয়ম অনুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু লাঠির ওপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো তিনি ইবাদতরত আছেন। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। এমতাবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়। এর মাঝে বাইতুল মুকাদ্দাসের কাজও সমাপ্ত হয়। অন্য দিকে আল্লাহর B"Q^W হ্যারত সুলাইমান (আ.)-এর লাঠি উই পোকায় খেয়ে ফেলে।

লাঠি পড়ে গেলে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন সবাই জানতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর। আল্লাহর বাণী-

“যখন আমি তার (সুলাইমানের) মৃত্যু ঘটাইম তখন জিনদিগকে তার মৃত্যুর বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা যা, তার লাঠি খেয়েছিল। (সুরা সাবা, আয়াত ১৪)

তাঁকে জেরুজালেমের কুবাতুস্সাখারে দাফন করা হয়। জানবুদ্ধির আলোকে মানবিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় যে উদাহরণ হযরত সুলাইমান (আ.) আমাদের শিখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর একটি m² ||Pvi m³ K⁴Abf "Q` লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২

হযরত মুসা (আ)

আগমন বার্তা

প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের ‘ফিরআউন’ বলা হতো। হযরত মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরআউনের নাম ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুসায়াব। তাঁকে ‘দ্বিতীয় রামসিস’ (Ramses II)ও বলা হয়। ফিরআউন স্বপ্নে দেখে যে, ‘বাহতুল মুকাদ্দাস’ থেকে এক ঝলক আগুন এসে মিসরকে গ্রাস করে ফেলেছে তার অনুসারী ‘কিরতি’ সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে ॥ ॥"Q | কিন্তু বনি ইসরাইলদের কোনো ক্ষতি করছে না। ফিরআউন তার রাজ্যের সকল স্বপ্ন বিশারদ থেকে একসাথে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চায়। তারা বলল, ইসরাইল বংশে এমন এক পুত্রস্তানের আগমন হবে যে আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে ধ্বংস করে দেবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ফিরআউন ভীষণ উত্তেজিত ও দুর্ঘাতায় পড়ে গেল। ফিরআউন সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল যে, বনি ইসরাইল গোত্রে কোনো পুত্রস্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে যেন হত্যা করা হয়। এভাবে অসংখ্য ইসরাইলি পুত্রস্তান ফিরআউনের সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

জন্ম

এমন দুসময়ে মৃত্যু পরওয়ানা কাঁধে নিয়ে হযরত মুসা (আ) খ্রিস্টC^E ১৩৫১ সনে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মহিমায় ফিরআউনের সৈন্যবাহিনী এ সংবাদ জানতে পারল না। অপরদিকে হযরত মুসা (আ)-এর জন্মী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ইশ্বরায় হযরত মুসা (আ)-কে তাঁর মাতা সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। আল্লাহর কী মহিমা! সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফিরআউনের রাজ প্রাসাদের ঘাটে গিয়ে ভিড়ল। ফিরআউনের - ২৪ হযরত আসিয়া (আ) সিন্দুকটি খুললেন। ফুটফুটে একটি সুন্দর শিশু দেখে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। নিঃসন্তান হযরত আসিয়া (আ) শিশুটি লালন-পালন করতে লাগলেন। শিশু মুসা অন্য কারো দুধ পান না করায় তাঁর মাকেই ধাত্রী নিয়েগ করা হলো। মহান আল্লাহর কুদরতে মুসা (আ) তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানেই ফেরআউনের ঘরে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। আল্লাহ বলেন-

فَرَجَعْنَكَ إِلَى أَمْكَ كُنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْرَنْ

“তখন আমি তোমাকে (মুসা) তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং সে দুঃখ না পায়।” (সুরা তৃহা, আয়াত ৪০)

শিশুকালে ফিরআউন একবার মুসা (আ.)-কে কোলে তুলে নেয়। তখন শিশু মুসা (আ.) ফিরআউনের দাঢ়ি ধরে তার মুখে চড় মারেন। এতে ফিরআউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করতে চাইল এবং বলল এই সেই শিশু যে আমার রাজত্ব ধ্বংস করবে। তখন হ্যরত আসিয়া (আ.) এক ভয়ংকর অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে শিশু মুসাকে ফিরআউনের রোষানল থেকে রক্ষা করেন। তখন অগ্নি মুখে নেওয়ায় তার মুখে জড়তা তৈরি হয়।

মাদায়িনে হিজরত

একদা হ্যরত মুসা (আ.) দেখতে পেলেন একজন কিবতি জনৈক ইসরাইলিকে অত্যাচার করছে। তিনি অত্যাচারিত লোকটিকে বাঁচানোর জন্য অত্যাচারী কিবতি লোকটিকে একটি ঘৃষি মারলেন। এতে লোকটি মারা যায়। হ্যরত মুসা (আ.) হতবাক হয়ে যান এবং ফিরআউনের ভয়ে মিসর ত্যাগ করে মাদায়িনে হিজরত করেন। সেখানে হ্যরত শুয়াইব (আ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হ্যরত মুসা (আ.) তাঁর সান্নিধ্যে দশ বছর অতিবাহিত করেন। হ্যরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা সফুরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন।

নবৃত্ত লাভ

খ্রিস্ট ১২৮৮ সালে মুসা (আ.) তাঁর পরিবারসহ মাদায়িন থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তুর পাহাড়ের পাদদেশে আসার পর সম্ম্যাহ হয়ে যায়। রাত্রি যাপনের জন্য তিনি পাহাড়ের নিকটে ‘তুয়া’ নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখানে নবৃত্ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব, যা প্রত্যাদেশ হয় তা শুনতে থাকো।” (সুরা তৃহা : ১৩) আল্লাহ তাআলা হ্যরত মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে কথাবার্তা বলতেন। আর এ কারণে তাঁকে ‘কালিমুল্লাহ’ বলা হতো।

দীনের দাওয়াত

নবৃত্ত লাভের পর হ্যরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে দীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন। যেহেতু তাঁর মুখে জড়তা ছিল তাই তাঁর আবেদনের প্রক্ষিতে আল্লাহ হ্যরত হারুন (আ.)-কে নবৃত্ত দান করেন এবং তাকে মুসা (আ.)-এর সহযোগী করে দেন। হ্যরত মুসা (আ.) হ্যরত হারুন (আ.)-কে নিয়ে ফেরআউনের কাছে যান এবং দীনের দাওয়াত দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

“ফিরআউনের নিকট যাও নিশ্চয়ই সে *mīgī j•Nb* করেছে। অতঃপর বলো, তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? আর আমি কি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথ দেখাব? যাতে তুমি তাকে ভয় করো।” (সুরা আন-নাফিয়াত, আয়াত ১৭- ১৯)

হযরত মুসা (আ.) ফিরআউনকে তাঁর মু'জিজাগুলো দেখালেন এবং তাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কথা বললেন। ফিরআউন এতে কর্ণপাত করল না। উপরন্তু সে হযরত মুসা (আ.)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

সত্যের জয় মিথ্যায় ক্ষয়

হযরত মুসা (আ.) ফিরআউনের ঘড়্যন্ত্র বুঝে ফেললেন। তাই তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে চলে *hw'Qtjb*। ফিরআউন হযরত মুসা (আ.) ও তার দলবলের মিসর ত্যাগের খবর শুনে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পিছে ছুটল। হযরত মুসা (আ.) তাঁর দলবল নিয়ে নীল নদের তীরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে ফিরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের খুব কাছাকাছি চলে এলো। তখন মুসা (আ.)-এর অনুসারীরা ভয় পেয়ে গেল। মুসা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার রব আমাদেরকে পথ দেখাবেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ.) তাঁর লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত করলেন। নদীর পানিতে *i^-I*। তৈরি হলো। বনি ইসরাইলের ১২টি দলের জন্য ১২টি পথ হয়ে গেল। হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা নিরাপদে নদী অতিক্রম করলেন। ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের নদী পার হতে দেখে তাঁদের অনুসরণ করল। যখন তারা নদীর মাঝখানে পৌছল তখনি *i^-I*। নদীর পানিতে মিশে গেল। ফলে ফিরআউন তার দলবলসহ ডুবে মরল। আল্লাহর নবিকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হলো। আর এভাবে সত্যের জয় হলো।

তাওরাত লাভ

আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-কে তাওরাত কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করলেন। তিনি আল্লাহর আদেশে তাওরাত কিতাব আনতে তুর পাহাড়ে গেলেন। সেখানে ত্রিশ দিন থাকার *B'QI* করলেন কিন্তু আল্লাহর *B'QIQ* আর দশ দিন বেশি অবস্থান করলেন। তুর পাহাড়ে হযরত মুসা (আ.) রোয়া, ইতিকাফ ও কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তিনি তুর পাহাড়ে থাকাকালীন সময়ে তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এমতাবস্থায় তাঁর অনুসারীদের অনেকেই 'সামেরি' নামক এক ব্যক্তির মোঁকায় পড়ে গো-বৎস *CR*। শুরু করে। হযরত মুসা (আ.) তাওরাত কিতাব নিয়ে এসে তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হলেন। তখন তাওরা হিসেবে গো-বৎস *CRwi f`i*। একে অপরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যার ফলে সত্তর হাজার বনি ইসরাইল নিহত হয়। হযরত মুসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) আল্লাহর নিকট খুব কানাকাটি করেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন।

হযরত মুসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সিনাই উপত্যকায় ইতিকাল করেন। তাঁকে তুর পাহাড়ের পাদদেশে সমাহিত করা হয়। আমরা হযরত মুসা (আ.) এর মতো নিভীক হয়ে সত্যের পথে মানুষকে ডাকব। সৎ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণেই জীবনের সাফল্য নিহিত।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত মুসা (আ.)-এর মুজিয়ার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৩

হ্যরত ঈসা (আ.)

পরিচয়

মানুষের মুক্তির পয়গাম নিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব নবি ও রাসূল আগমন করেছেন হ্যরত ঈসা (আ.) তাদের অন্যতম। *॥d̄ij ॥ ۱۳* ‘বাইত লাহম’ (বেথেলহাম) নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম মারিয়াম বিনতে হাল্লা বিনতে ফাখুজ। হ্যরত ঈসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল হতেই খ্রিস্টাব্দ গণনা করা হয়। পবিত্র কুরআনে তাঁকে ‘মাসিহ বিন মারিয়াম’ কালিমাতুল্লাহ ও *۱۴* ইত্যাদি ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। তার ওপর আসমানি কিতাব ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে।

মু'জিজা

আল্লাহ তায়ালা তাকে মু'জিজা (অলৌকিক) ক্ষমতা দান করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় বাক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা মু'জিজা হিসাবে তাঁকে মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করার শক্তি দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে মাটির তৈরি পাখিতে ফুৎকার দিয়ে জ্যান্ত বানিয়ে ফেলতেন। আল্লাহ বলেন-

“আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটি পাখির আকৃতি তৈরি করব। অতঃপর তাতে ফুৎকার দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগাঁ*۱۵* নিরাময় করব এবং আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করব।” (*mj*। আলে-ইমরান, আয়াত ৪৯)

হত্যার ষড়যন্ত্র

হ্যরত ঈসা (আ.) ইহুদিদেরকে তাদের অপকর্ম হতে বাধা দিলে তারা তাঁর ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয় এবং তাকে অনেক কষ্ট দেয়। পাশাপাশি হত্যার ষড়যন্ত্রও করে। এ হীন উদ্দেশ্যে তারা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর ঘর অবরোধ করে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য ‘তাইতালানুস’ নামক জনৈক নরাধমকে পাঠায়। কিন্তু মহান আল্লাহ হ্যরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। আর ‘তাইতালানুস’ নামক ঐ ব্যক্তিকে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি দান করেন। সে হ্যরত ঈসা (আ.)-কে কোনো কিছু করতে না পেরে বাইরে চলে আসে। অপেক্ষমাণ লোকজন তাকে হ্যরত ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করে। অতঃপর সবাই মিলে তাকে ক্রুশ বিন্দু করে হত্যা করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন-

“তারা (তাঁকে ঈসা) হত্যাও করে নি ক্রুশবিন্দুও করে নি বরং তারা এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল, যারা তার *۱۶* মতবিরোধ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয় যুক্ত ছিল। এ *۱۷* অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে তারা তাঁকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ তাঁকে তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।” (সুরা নিসা, আয়াত ১৫৭-১৫৮)

পুনরায় 'মনয়ায় আগমন

শেষ যামানায় পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে হ্যরত ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন। এসে তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। জিয়িয়া প্রথা (অমুসলিম থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর) তুলে দেবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। mg-ÍKKI মেরে ফেলবেন। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় পৃথিবীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হবে যে, দান-সদকা নেওয়ার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হ্যরত ঈসা (আ.) মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মত হয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাঁকে রাসুল (স.)-এর রওজা মুবারকে তাঁর পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা দুজন একই স্থান হতে উঠবেন।

ঁান্ত Wekjim

খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর উমাত মনে করে। অধিকাংশ খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মারিয়াম (আ.) আল্লাহর নৃ। এবং হ্যরত ঈসা (আ.)-কে ইহুদিরা ক্রুশবিন্ধ করে হত্যা করেছে। তবে কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান যারা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইমান এনেছিল ও তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে পবিত্র কুরআনে 'হাওয়ারি' (সাহায্যকারী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা হ্যরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّ ۝

“বলো, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি।” (সুরা ইখলাস, আয়াত ১-৩)

হ্যরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। তাঁকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিকে হ্যরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। হ্যরত ঈসা (আ.) সংসারত্যাগী ছিলেন। কোনো ঘরও বাঁধেন নি এবং বিয়েও করেন নি। সারা জীবন তাওহিদ (আল্লাহর একত্বাদ) প্রচার করে অতিবাহিত করেছেন। কী অবাক ব্যাপার! তাঁর উম্মাতেরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে প্রকাশ্যে শিরকে লিপ্ত nūl | আল্লাহ তাত্ত্বালা হ্যরত আদম (আ.)-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর জন্য হ্যরত ঈসা (আ.)-কে শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্টি করা মোটেও কঠিন ব্যাপার নয়।

তাই হ্যরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলার কোনো কারণ নেই। হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহর ক্ষমতার বহিপ্রকাশ। সুতরাং সকলের উচিত তাঁর ব্যাপারে সঠিক আকিদা পোষণ করা যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করবেন। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করব না এবং হ্যরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসুল হিসেবেই বিশ্বাস করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিজার একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪

হযরত মুহাম্মদ (স.)

হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মদিনায় অবস্থানকালে মাত্র[॥] মক্কার প্রতি দূরদ অনুভব করেন। তাই তিনি ষষ্ঠি হিজরি সনে ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কার A`‡i হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাধ্যপ্রাপ্ত হন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিকগণ এটাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরিত্র কুরআনে এ সন্ধিকে “ফাতহুম মুবিন” (ম্যাপ্রিও বিজয়) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের প্রক্ষাপট

কারণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সন্ধিতে দশ বছর CIV-ÚWI K যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ ছিল। হুদায়বিয়ার MÝW` Z চুক্তির শর্তানুযায়ী আরবের বনু খুয়া'আ গোত্র মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মেট্রী চুক্তিতে আবন্ধ হয়। বনু বকর গোত্র হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলে ঘড়্যন্ত্র শুরু করে। তারা একরাতে মহানবি (স.)-এর সাথে মেট্রী চুক্তিতে আবন্ধ বনু খুয়া'আ গোত্রের ওপর আক্রমণ করে। এতে বনু খুয়া'আ গোত্রের কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়। আহত হয় আরও অনেকে। বনু খুয়া'আ গোত্রের লোকজন ঘটনাটি মহানবি (স.)-কে জানায়। তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করে। মহানবি (স.) চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। Z মারফত কুরাইশদের কাছে তিনি এ ঘটনার কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি তাদের জানালেন-

- ক. তোমরা খুয়া'আ গোত্রকে MÝZC‡V দাও;
- খ. অথবা বনু বকর গোত্রের সাথে মিত্রতা চুক্তি বাতিল কর;
- গ. অথবা হুদায়বিয়ায় MÝW` Z চুক্তি বাতিল কর।

কুরাইশরা শেষটাই গ্রহণ করল। হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে গেল।

ফলে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য হুদায়বিয়া চুক্তির বাধ্যবাধ্যকতা আর রইল না। পরে কুরাইশরা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারল। তখন আপস-মীমাংসার জন্য কুরাইশরা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠাল। এ পর্বে আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। অপরদিকে মহানবি (স.) মক্কা অভিযানের C‡' Z নিতে লাগলেন।

মক্কা বিজয়

হিজরি অষ্টম বছরের রমযান মাসে দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মহানবি (স.) মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। মহানবি (স.) মক্কার A`‡i ‘মারবুজ জাহরান’ নামক স্থানে তাঁরু গেড়ে অবস্থান নেন। অপ্রত্যাশিতভাবে

উপনীত এ বিশাল বাহিনী দেখে আবু সুফিয়ানসহ মক্কাবাসী হতবাক হয়ে যায়। তারা বাধা দেওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে। বিনা বাধায় মহানবি (স.) জন্মগ্রহণ মক্কা জয় করেন। স্বীয় জীবন ও ইসলাম রক্ষা করার জন্য মহানবি (স.) একদিন মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ বিজয়ী বীর বেশে তিনি জন্মগ্রহণ মক্কায় প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তিনি আজ মক্কার GK"QI অধিপতি। সত্যের বিজয় হলো আর মিথ্যার পরাজয় হলো। সত্যের পথে থাকলে বিজয় একদিন আসবেই।

মহানবি (স.)-এর উদারতা

মক্কার যে সকল লোক একদিন মহানবি (স.) এর জীবন নাশ করতে চেয়েছিল আজ তারাই তাঁর সমুখে অপরাধী ও দয়া ভিখারি হিসেবে উপস্থিত। মহানবি (স.) তাদের জিজেস করলেন, ‘তোমরা আজ আমার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করো।’ তারা বললো- **أَنْتُمْ كُلُّ أُخْرَى وَإِنِّي مُحْسِنٌ إِلَيْكُمْ** অর্থ- ‘আপনি আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার নিকট **وَلَا يَعْلَمُ** ব্যবহারই আমরা চাই।’

তখন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন- **إِنَّمَا الظَّلَاقَاءُ إِذْبَابُ الْيَوْمِ** অর্থ- ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।’

দয়ালু নবি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এমনকি একসময়ের ইসলামের সবচাইতে বড় শত্রু আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করে দিলেন। উহুদ যুদ্ধে এ আবু সুফিয়ানই কুরাইশ বাহিনীর (অমুসলিম বাহিনীর) নেতা ছিল। তার নেতৃত্বে কাফির বাহিনীর হাতে ৭০ জন মুসলমান সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মহানবি (স.)-এর একটি দাঁত মোবারক ঐ যুদ্ধে শহীদ হয়। এত কিছুর পরও মহানবি তাকে ক্ষমা করেছিলেন। শুধু ক্ষমাই শেষ নয়। মহানবি (স.) আরও ঘোষণা দিলেন ‘স্বীয় ঘর ও কাবা শরিফের পাশাপাশি যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তারাও ক্ষমা এবং নিরাপত্তা পাবে।’ মহানবি (স.) আবু সুফিয়ানের **وَلَا يَعْلَمُ** হিন্দাকেও ক্ষমা করলেন। হিন্দা মহানবি (স.)-এর প্রিয় চাচা হযরত হাময়া (রা.) শহীদ হওয়ার পর তাঁর নাক, কান কেটেছিল এবং বুক চিরে কলিজা বের করে চর্বণ করে চরম নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার পরিচয় দিয়েছিল। তাকেসহ মক্কার সকলকে ক্ষমার এ দ্রষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাতৃত্ববন্ধন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে হিজরত করে আসা মুহাজির ও মদিনায় বসবাসকারী আনসারদের মধ্যে ভাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করেছিলেন। ভাতৃত্ব বন্ধন অটুট রাখার জন্য মহানবি মসজিদে নববিকে মিলনকেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। এ ভাতৃত্ব শুধু মুখে মুখে ছিল না বরং মুহাজিরদেরকে আনসারদের **وَلَا يَعْلَمُ**। উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিকের ঘরে যেদিন এ ভাতৃত্ববন্ধন তৈরি করেছিলেন ঐ দিন ঐ গৃহে মোট ৯০ জন সাহাবি ছিলেন। তাদের অর্ধেক ছিল মুহাজির আর বাকি অর্ধেক ছিল আনসার। **وَلَا يَعْلَمُ** মুহাজিরদের উত্তরাধিকার বিধানটি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। **Rబ్రింగ్** আবদ্ধ না হয়ে এমন ভাতৃত্ববন্ধন মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বিদায় হজের ভাষণ

সুরা আন-নাছর নাথিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তার জীবন প্রায় শেষ। তাই তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে (দশম হিজরি) ২৩ ফেব্রুয়ারি লক্ষাধিক সাহাবিকে সাথে নিয়ে হজ করতে মক্কা অভিমুখে

রওয়ানা দিলেন। একে বিদায় হজ বলা হয়। হ্যারত মুহাম্মদ (স.) ৯ই জিলহজ আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত জনসমূহের সামনে যে ভাষণ দেন, তাকে বিদায় হজের ভাষণ বলা হয়। উক্ত ভাষণে তিনি ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয়জীবন পর্যন্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব, লেনদেন, CVI -Úni K ম্পÚK[©] অধিকার ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। নিম্নে বিদায় হজে প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো। আরাফাতের ময়দান সংলগ্ন ‘জাবালে রহমত’ এর উঁচু টিলায় উঠে মহানবি (স.) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন:

১. হে মানব সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ আগামী বছর আমি তোমাদের সাথে এখানে সমবেত হতে পারব কি না জানি না।
২. আজকের এ দিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনই তোমাদের জীবন ও ॥ম্পÚ Cí -Útii নিকট পবিত্র।
৩. মনে রাখবে অবশ্যই একদিন সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেদিন সকলকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হবে।
৪. হে বিশ্বসীগণ, ॥خاتمٌ। সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনই তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।
৫. সর্বদা অন্যের আমানত রক্ষা করবে এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে ও সুদ খাবে না।
৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। আর অন্যায়ভাবে একে অন্যকে হত্যা করো না।
৭. মনে রেখো! দেশ, বর্ণ-গোত্র, সম্পদায় নির্বিশেষে সকল মুসলমান সমান। আজ হতে বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হলো। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো আল্লাহ-ভীতি বা সৎকর্ম, সে ব্যক্তিই সবচাইতে সেরা যে নিজের সৎকর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।
৮. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাঢ়ি করো না, Cie[¶] অনেক জাতি এ কারণে ধ্বংস হয়েছে। নিজ যোগ্যতা বলে ক্রীতদাস যদি নেতা হয় তার অবাধ্য হবে না। বরং তার আনুগত্য করবে।
৯. দাস-দাসীদের প্রতি সম্ম্যবহার করবে। তোমরা যা আহার করবে ও পরিধান করবে তাদেরকেও তা আহার করাবে ও পরিধান করাবে। তারা যদি কোন অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলে, তবে তাদের মুক্ত করে দেবে, তবু তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। কেননা তারাও তোমাদের মতোই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মুসলিম একে অন্যের ভাই এবং তোমরা একই ভাত্তের বন্ধনে আবদ্ধ।
১০. জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো। তোমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বাণী এবং তাঁর রাসূলের আদর্শ রেখে hW^Q। এতে যতদিন তোমরা আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।
১১. আমিই শেষ নবি আমার পর কোনো নবি আসবে না।
১২. তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পেঁচে দেবে।

তারপর হযরত মুহাম্মদ (স.) আকাশের দিকে তাকিয়ে আওয়াজ করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌছাতে পেরেছি? সাথে সাথে উপস্থিত জনসমূহ হতে আওয়াজ এলো “হ্যাঁ”। নিচ্ছয়ই পেরেছেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স.) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। এর পরই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন-

أَلْيَوْمَ أَكُلُّ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمِئْتُ عَلَيْكُمْ بِعَيْقَنٍ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا অর্থ- “আজ আমি তোমাদের ধর্মকে $C\frac{1}{2}$ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্য CWI C $\frac{1}{2}$ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।” (সুর মায়িদা, আয়াত ৩)

মহানবি (স.) কিছুক্ষণ সময় নীরব থাকলেন। উপস্থিত জনতাও নীরব ছিল। অতঃপর সকলের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “আল বিদা” (বিদায়)। একটা অজানা বিয়োগব্যথা উপস্থিত সকলের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। বিদায় হজ থেকে ফিরে মহানবি (স.) কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর ১১ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬৩২ খ্রি: ৭ই জুন সোমবার ইঞ্চিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (স.)

জীবনের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় নিয়মনীতিকে আদর্শ বলা হয়। এ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন- **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** অর্থ- “নিচ্ছয়ই রাসুলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।” (সুরা আহ্যাব, আয়াত ২১)

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়েই হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের আদর্শ।

ক) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, হাস্যোজ্জল ও দয়ালু ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, ইয়াতিম, অসহায়, রাজা-প্রজা সকলের সাথে তার আচরণ ছিল অনুকরণীয়। তাঁর দয়া ও ভালোবাসা সকলের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও ফুটে ওঠে। তিনি শিশুদের প্রতি সদয় আচরণ করতেন। অন্যকেও তা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন- **رَبِّيْسٌ مِنَّا مَنْ لَمْ يُرِكْمْ صَغِيرًا** অর্থ- যে আমাদের শিশুদের প্রতি দয়া করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (সুনান তিরমিয়ি)

ক্রীতদাস থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, আত্মীয়-অনাত্মীয় এমনকি জীবজন্মের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন- “জমিনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানবাসীরাও তোমাদের প্রতি দয়া করবে।” (সুনান তিরমিয়ি)

এক কথায়, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সততা ও সত্যবাদিতা, সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম ও ওয়াদা পালনসহ অনুসরণীয় গুণগুণ রাসুল (স.)-এর জীবনে বিদ্যমান ছিল।

খ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পারিবারিক আদর্শ

পরিবার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একজন মানুষের জীবনে যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন সব গুণই মহানবি (স.)-এর জীবনে ছিল। তিনি "خ-Kb"৷, পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের জন্য আদর্শ ছিলেন। পরিবারের যেকোনো সদস্য তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তাদের সাথে সদা সত্য কথা বলতেন। মিথ্যাকে তিনি আজীবন ঘৃণা করতেন। তাঁর ব্যবহারে নম্রতা প্রকাশ পেত। তিনি পরিবারের সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কোনো বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। পরিবারের কারো প্রতি রাগ করলে শুধু মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ভালো-মন্দ কিছু বলতেন না। তাঁর পরিবারে একাধিক "خ" থাকার পরও তিনি সকলের সাথে সমান আচরণ করতেন। তাঁর আচরণের কারণে পরিবারের কোনো সদস্যের মাঝে কখনো বাগড়া বিবাদ হয় নি।

গ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সামাজিক আদর্শ

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাঁর mg-؎ জীবনই ছিল সংস্কারাধর্মী। সমাজ ও জাতীয় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তিনি সুন্দর ও কল্যাণমুগ্ধ করে সংস্কার করেন নি। সামাজিক অত্যাচার ও অন্ধকার অনাচারে নিমজ্জিত আরব সমাজে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহেলি যুগে বিভিন্ন কারণে গোত্রদন্ত লেগে থাকত। সামান্য কারণেই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বেধে যেত। তা ছাড়া আরব মরুচারী গ্রাম্য লোকেরা লুটতরাজ করত। হযরত মুহাম্মদ (স.) mg-؎ যুদ্ধের অবসান ঘটালেন এবং লুটতরাজ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নারীদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেন। ইসলাম Cেঁয়ুগে আরবের অনেক গোত্রে ও সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তারা কেবল ভোগের পাত্র ছিল। উত্তরাখিকারী MYWÉ হতে তারা eWAZ ছিল। মহানবি (স.) নারীদের এসব দুর্গতি হতে রক্ষা করেন। তাদের ধর্মীয় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেন। তিনি ঘোষণা করেন- أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ تَعْزِيزَتْ أَقْبَلَ، অর্থ- “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।” (কানযুল উমাল)

মহানবি (স.) কন্যাসন্তানকে জীবিত করব দেওয়া বন্ধ করেন। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে অভিশাপের পরিবর্তে সম্মানের বলে আখ্যা দেন। সুন্দরভাবে কন্যাসন্তান লালন-পালনকারীর জন্য বেহেশতের ঘোষণা দেন। ধনী-গরিব সকলের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। গোলাম-দাসী সকলের দাওয়াত গ্রহণ করতেন। তাঁর আচার-আচরণে হতাশাগ্রস্থ মানুষ দিকনির্দেশনা পেত।

এ ছাড়া তিনি সামাজিক সকল অনাচার ও বৈষম্য ــ+ করেন। ছোট-বড় সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সকল প্রকারের সামাজিক ও নেতৃত্ব অবক্ষয় যেমন-সুদ, ঘৃষ, মদ, জুয়া ও বেহায়াপনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এভাবে তিনি সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাজনৈতিক আদর্শ

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) Cii C^o ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসাধারণ দ্রষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় আল কুরআনের সর্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন।

ইসলাম C^o যুগে আরবের অনেক সমাজ ও গোত্র ‘জোর যার মূল্যক তার’ এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। মহানবি (স.) দেশ পরিচালনায় জনগণের মতামতের স্বীকৃতি দেন। যা গণতন্ত্রের মূল কথা। তিনি ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বর্ণ, গোত্র সকল বৈষম্যের অবসান ঘটান। রাষ্ট্রের সকলের সমত্বাধিকার ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অমুসলিম নাগরিকদেরও নিরাপত্তা দেন। তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের চোখে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্ম, বর্ণ-গোত্র সকলে সমান এ নীতির *إِلَيْكُمْ* করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ভিত্তি মজবুত করার জন্য মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি *মিয়া` b* করেন। এ চুক্তি ‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত।

ঙ) মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর অর্থনৈতিক আদর্শ

মহানবি (স.) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত চক্ৰবৃন্দি হারে সুদের যে প্রচলন ছিল তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুদের পরিবর্তে ব্যবসাকে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ বলেন- *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا*

“আল্লাহ সুদকে হারাম (নিষিদ্ধ) আর ব্যবসাকে হালাল (বৈধ) করেছেন।” (*মি* ॥ বাকারা, আয়াত ২৭৫)

ঘূষ প্রথাও তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন: “ঘূষ গ্রহীতা ও ঘূষ দাতা উভয়ে জাহানামি”। সমাজ থেকে তিনি C^o vi Yigj K সকল ব্যবসা বন্ধ করে দেন। *মিয়া`*। সুবর্ম বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। *মিয়া`* যাতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত থাকে তার উদ্যোগ নেন। রাজস্বের উৎস হিসেবে যাকাত, গণিমত (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী), জিয়িয়া (অমুসলিম হতে আদায়কৃত নিরাপত্তা কর), খারাজ (অমুসলিমদের *fitq*), উশর (মুসলিমদের উৎপন্ন ফসলের কর) ইত্যাদি গ্রহণ করেন।

পাঠ ৫

হযরত আয়িশা (রা.)

পরিচয়

হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বকনিষ্ঠা । তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। তাঁর মায়ের নাম উমে বুমান। তাঁর উপাধি ছিল ‘সিদিকা’ ও ‘হুমায়রা’। আর তাঁর উপনাম *fitj* ।-D^o মুমিনিন ও উম্মু আবুল্লাহ। তিনি হিজরতের C^o ৬১৩/৬১৪ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ বংশের নিয়মানুযায়ী জন্মের পর তাঁর লালন-পালনের ভার দেওয়া হয় ওয়ায়েল নামে এক লোকের । উপর। শিশুকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রথম মেধার অধিকারিনী। শিশুকাল থেকে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। শৈশবকালেই তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা ও মেধাশক্তি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর মধ্যে সর্বদা শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তিনি অন্য শিশুদের মতো খেলাধুলা, Av^ogv` d^oZ^o ও দোড়াদোড়ি করতে ভালোবাসতেন।

হয়েরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর নবুয়তের দশম সনে মহানবি (স.)-এর সাথে হয়েরত আয়িশা (রা.)-এর শুভ বিবাহ $\text{ঃ} \text{ঃ} \text{ঃ}$ হয়েছে। হয়েরত খাওলা বিনতে হাকিম ছিলেন এ বিবাহের ঘটক। এ বিয়েতে দেনমোহর নির্ধারিত হয় ৪৮০ দিরহাম। বিবাহের তিন বছর পর রাসুল (স.)-এর সাথে হয়েরত আয়িশা (রা.)-এর 'ঃ' জীবন শুরু হয়। হয়েরত আবু বকর (রা.) বিবাহের কাষির দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষাজীবন

তৎকালীন আরব সমাজে লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। হয়েরত আয়িশা (রা.) পিতার কাছ থেকেই gjZ লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যা একবার শুনতেন সাথে সাথে $gj-$ করে ফেলতেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ছাড়াও তিনি গৃহস্থালী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ইফকের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরি সনে বন্ধু $gj\text{ }WjK$ যুদ্ধে রাসুল (স.)-এর সাথে হয়েরত আয়িশা (রা.)ও ছিলেন। যুদ্ধ হতে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হারানো হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা হতে পিছনে পড়ে যান। ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এ সুযোগে মুনাফিকরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করল। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একেবারে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারান নি। আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে অটল ছিলেন। এ সময়ে রাসুল (স.)ও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। তিনি চিন্তিত হলেন। হয়েরত আয়িশা (রা.)-এর পিতামাতাও চরম উৎকর্ষা, দুর্শিক্ষা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। অবশেষে হয়েরত আয়িশা (রা.)-এর পরিত্রিতা বর্ণনা করে সুরা নুরে ১১-১২ নম্বর আয়াত নাজিল হলো। মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। রাসুল (স.) চিন্তামুক্ত হলেন। হয়েরত আয়িশা (রা.)-এর পরিত্রিতা ও চারিত্রিক মাধুর্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শিক্ষায় অবদান

হয়েরত আয়িশা (রা.) ছিলেন বিচক্ষণ, বৃদ্ধিমতী অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারিনী। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ বৃৎপত্তি অর্জন করেন। বিশেষ করে তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও আরবদের বিভিন্ন ঘটনা $\text{ঃ} \text{ঃ} \text{ঃ}$ তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শরিয়াতের বিভিন্ন মাসয়ালা মাসয়াল ও নীতিগত বিষয়ে তার পরামর্শ নেওয়া হতো। $Zj\text{ }bjgjK$ কম বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদিস ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ৫৪টি হাদিস এবং ইমাম মুসলিম ৬৯টি হাদিস এককভাবে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশেষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইবনে শিহাব জুহুরি বলেন, 'তিনি (আয়েশা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।' (তাহফিবুত্ত তাহফিব)

শিক্ষকতা

উমুল মোমিনিন হয়েরত আয়িশা (রা.) শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষভাবে নারীদের বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হতো। তিনি হাদিস শিক্ষাদানে বেশি সময় ব্যয় করতেন। একসাথে তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ছিল ২০০-এর অধিক। অনেক বড় বড় সাহাবি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ঘটনা, প্রশ্নাওর এবং সামাজিক Al-Ziyara আলোকে শিক্ষা দিতেন। হয়রত আবু মুসা আশয়ারি (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.), আমর ইবনে আছ (রা.) প্রমুখ সাহাবি তাঁর হাদিসের পাঠদানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

জীবনাদর্শ

হয়রত আয়িশা (রা.)-এর চরিত্র ও আদর্শ অতুলনীয়। তিনি তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন, অনন্য সুন্দরী, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি Al-Iman সত্যের সাধক, আদর্শ স্বামী সেবিকা, জ্ঞানতাপস সদালাপী। এক কথায় বলতে গেলে মানবীয় চরিত্রের সকল গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

মুনাফিক ও হিংসুকগণ তাঁর ওপর যে অপবাদ দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ধৈর্যই তাকে অক্ষত রেখেছিল।

রাতের অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গরিব অসহায়দের দান সদকা করতে তিনি পছন্দ করতেন ও আনন্দ পেতেন। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, দয়া-পরপোকারিতা, ইবাদতকারিনী সর্ব প্রকার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। স্বামী প্রেমও তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসূল (স.)ও তাঁর সাথে খেলাধুলা ও দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পর তিনি কঠোরভাবে পর্দা করতেন।

হয়রত আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা

হয়রত আয়িশা (রা.) রাসূল (স.)-এর অতি আদরের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি মহানবি (স.)-এর অন্য Al-Asra । থেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসূল (স.) বলেন- “নারী জাতির ওপর আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্যসামগ্রীর ওপর সারিদের মর্যাদা।” (বুখারি ও ইবনে মাজাহ)। সারিদ হলো আরবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, যা রুটি গোশত ও বোলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। রাসূল (স.) আরও বলেন-“আয়িশা (রা.) হলেন-মহিলাদের সাহায্যকারিনী।” (কানযুল উমাল)

একবার নবি কারিম (স.) আয়িশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন-“হে আয়িশা! ইনি জিব্রাইল, তোমাকে সালাম Al-Asra (বুখারি)। হয়রত আয়িশা (রা.) নিজ বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। আজকের নারী সমাজও যদি হয়রত আয়িশা (রা.)-এর মতো তপস্যা করেন তাহলে তাঁরাও মর্যাদাবান হবেন।

ইতিকাল

উমুল মোমেনিন হয়রত আয়িশা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমযান ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই ইতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর। রাসূল (স.)-এর ইতিকালের পর আরও ৪০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

হয়রত আয়িশা (রা.)-এর ধৈর্য, জ্ঞানসাধনা, পাদ্রিত্য, স্বামীভক্তি ও চারিত্রিক মাধুর্য আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হয়রত আয়িশা (রা.)-এর উত্তম চরিত্রের উপর একটি Aby-Q লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আয়িয (র.)

পরিচয়

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আয়িয ৬১ হিজরি সনে উমাইয়া বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল আয়িয। মাতা হলেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর স্তোত্রী উম্মু আসিম লায়লা। তিনি একজন উমাইয়া খলিফা ছিলেন। তাঁকে ‘দ্বিতীয় উমর’ ও ইসলামের $\text{O}^{\circ}\text{C}^{\circ}\text{A}^{\circ}\text{G}$ খলিফা’ বলা হয়।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন

শিশুকাল হতেই তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও জ্ঞানতাপস। শিশু বয়সে তিনি পিতার সাথে মিসর গমন করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। এরপর তিনি কুরআন ও হাদিসের D^oPZⁱ জ্ঞান লাভের আশায় মদিনায় গমন করেন। তৎকালীন সময়ে মদিনার বিখ্যাত শিক্ষকদের নিকট হতে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির ও আরবি সাহিত্যের উপর D^oP শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি উমাইয়া শাসক খলিফা আব্দুল মালিকের কন্যা ফাতিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

গভর্নর পদে নিয়োগলাভ

খলিফা ওয়ালিদ উমর ইবনে আব্দুল আয়িযকে ৮৭ হিজরি সনে মদিনার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ সহকারে দায়িত্ব পালন করেন। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি মজলিশে শুরা গঠন করেন। এর সদস্য ছিল দশ জন মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) লোক। তিনি শাসনকার্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজলিশে শুরার মতামত গ্রহণ করতেন।

শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি নেতৃত্ব মূল্যবোধঃপূর্বে বিচারক নিয়োগ করেন। গভর্নর থাকাকালে তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ কারণে তৎকালীন প্রখ্যাত মনীষী সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব তাঁকে ‘মাহদি’ (সুপথপ্রাপ্ত) উপাধি দিয়েছিলেন।

জনকল্যাণমূলক কাজ

গভর্নর নির্বাচিত হয়ে উমর ইবনে আব্দুল আয়িয জনসাধারণের কল্যাণার্থে কাজ শুরু করেন। তিনি ‘মসজিদে নববি’র সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধিত করেন। তিনি অসংখ্য ঘরবাড়ি, পয়ঃপ্রণালী ও $\text{I}^{\circ}\text{WJU}$ নির্মাণ করেন। পিপাসার্ত মানুষের জন্য তিনি অনেক KC খনন করেন। মসজিদে নববির বাগানে একটি ঝর্ণা ও $\text{fP}^{\circ}\text{Se}^{\circ}\text{P}^{\circ}$ নির্মাণ করেন। সমগ্র এলাকায় বিশেষ করে মক্কা, মদিনা ও তায়েফের মাঝে চলাচলের জন্য সংযোগ সড়ক তৈরি করেন।

শুধু RbKj WYgjK কাজ নয় তিনি জ্ঞানেরও প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। গভর্নর থাকাকালেও তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কুরআন, হাদিস ও অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন।

খলিফা পদ লাভ

হিজরি ১৯ সন মোতাবেক ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক ইস্তিকাল করলে উমর ইবনে আব্দুল আয়িয মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন।

খলিফা নিযুক্ত হয়ে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের গৃহীত সকল অন্যায় নীতি বাতিল করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে খলিফা নির্বাচনে বিশুদ্ধী ছিলেন। তাই তিনি উপস্থিত লোকদের বলেন- ‘হে মানবমঙ্গলী! আমার *Awb*”QI ও সাধারণ মানুষের মতামত ছাড়া আমাকে খলিফা মনোনীত করা হয়েছে। আমি আপনাদের বাধ্য করছি না, আপনারা যাকে *B*”QI খলিফা নির্বাচন করুন।’ তার এ ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা বললো ‘আমরা আপনাকে খলিফা হিসেবে মেনে নিলাম, আমরা আপনার খিলাফতের ওপর সন্তুষ্ট।’ অতঃপর তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর প্রাদেশিক গভর্নরদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন-‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তার কিতাব মেনে চলো এবং রাসুলের সুন্নাত অনুসরণ কর।’

উমাইয়া বংশের লোকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের যে সকল *mīmū* দখল করে রেখেছিল তিনি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এবং যথাযথ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এমনকি তাঁর স্তীয় *-q̄i mīmū*, উপটোকেনসামগ্রী, গহনাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বাইতুল মালে জমা দেন। রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ *ev̄* *l̄eqb* করেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসননীতি অনুসরণ করেন। অনারব মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সর্বজনীন মানবতাবোধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে নিরপেক্ষ শাসননীতি প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রে সুখশান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য *Cēf̄Z* *U*মাইয়া খলিফাদের সাম্রাজ্যবাদী ও স্বার্থান্বেষী নীতি *mīmū* *f̄C* বর্জন করেন। রাষ্ট্রে ন্যায়প্রায়ণতা, ধর্মপ্রায়ণতা, সাম্যের ধারণা ও সকল জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাঁকে ‘উমাইয়া সাধু’ (*Umayyad Saint*) বলা হয়।

হাদিস সংকলনে অবদান

ইসলামি জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস *n̄t”Q* আল হাদিস। রাসুল (স.)-এর হাদিসগুলো হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে হ্যরত উমর বিন আব্দুল আযিয় খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হাদিসগুলো সংরক্ষণ ও সংকলনের জন্য তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্দেশ দেন। তিনি তাদের কাছে লেখেন-‘তোমরা রাসুল (স.)-এর হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলণ করো।’ তারই প্রচেষ্টায় মুসলিম বিশ্বে হাদিস সংকলিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ি, ইবনে মাযাহসহ অন্যান্য হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ফলে হাদিস হারিয়ে যাওয়া ও বিকৃতি হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা

উমর বিন আব্দুল আযিয় বিশ্বাস করতেন যে ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড’। তিনি গভর্নরদের নিকট প্রেরিত পত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিতেন। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি অনেক প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। শিক্ষকদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে সিন্ধু, আফ্রিকা, *Íubmn* বিভিন্ন দেশে ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে।

কৃতিত্ব

দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত হ্যরত উমর বিন আব্দুল আযিয় রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন-হাদিস ও খোলাফায়ে রাশেদিনের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাই তাঁকে চার খলিফার পর ইসলামের *CAG* খলিফা বলা হয়।

তাঁর আমলে কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের *Cf̄Z* উন্নতি সাধিত হয়। তিনি মানুষের মাঝে *Cvi* *úwi* *K* বিরোধ *+* করে সাম্য ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার এতবেশি উন্নতি হয়েছিল যে, যাকাত গ্রহণ করার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ (ইসলামি *AlBbk* *í* বিশেষজ্ঞ), মুজতাহিদ (ইসলাম ধর্মজ্ঞানে সুপ্রতিত) এবং কুরআন ও হাদিসের হাফিয়।

চরিত্র

হ্যরত উমর বিন আব্দুল আয়িত ছিলেন আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী, বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির মানুষ। তাঁর অস্তরে এত আল্লাহভীতি ছিল যে, তিনি প্রায় আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। খলিফা হয়েও তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দু-দিনহাম ভাতা গ্রহণ করতেন।

একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তিনি অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তার আমলে শ্রিস্টান, ইহুদি ও অগ্নি উপাসকগণকে তাদের গির্জা ও উপাসনালয় নিজ নিজ অধিকারে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তার আমলে সকল ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করত। তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে উদার চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। তিনি ‘আইলা’ ও সাইপ্রাসের শ্রিস্টানদের কর কমিয়ে দেন। নাজরানের শ্রিস্টানদের তিনি বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। জ্ঞানচর্চায় অমুসলিম মনীষীদেরও সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদের দ্বারা কয়েকটি গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

ইত্তিকাল

এ মহামনীষী ১০১ হিজরি মোতাবেক ৭১৯ শ্রিস্টান্দের রাজব মাসে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ইত্তিকাল করেন। তার খিলাফতকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর। আমরা হ্যরত উমর বিন আব্দুল আয়িয়ের জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। তাঁর ধর্মপরায়ণতা, জীবনসাধনা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অসাম্প্রদায়িক আদর্শ আমাদের জীবনে eIaqb করতে চেষ্টা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হ্যরত উমর বিন আব্দুল আয়িয়ের ধর্মপরায়ণতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী mPurK[®]সংক্ষেপে বাড়ির কাজ হিসেবে লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)

জন্ম ও পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে নারীদের মধ্যে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সত্ত্বা^১ অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) অন্যতম। এ মহান তাপসী রমনী ৯৯ হিজরি মোতাবেক ৭১৭ শ্রিস্টান্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে বসরি বলা হয়। তাঁর পিতা খুব দরিদ্র ছিলেন। যেদিন রাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঐ দিন রাতে তার পিতার ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর মতো তৈলও ছিল না। তাঁর পিতাও একজন মুত্তাকি (আল্লাহভীরু) ছিলেন। চার বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ ছিলেন। তাই তার নাম রাখা হলো রাবেয়া (চতুর্থ)। বাল্য বয়সেই তার পিতামাতা ইত্তিকাল করেন। ফলে তাঁকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়।

ক্রীতদাসী

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর পিতামাতার ইত্তিকালের পর তার বড় বোনেরা জীবন ও জীবিকার অন্বেষণে অন্যত্র চলে যান। এ সময়ে বসরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রীত হন। তাঁর মনিব ছিল

দুষ্ট প্রকৃতির। তাই তাঁকে দিয়ে অনেক কাজ করাত। রাবেয়া বসরি দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করতেন। তারপরও রাতের বেলায় বিনিদ্র থেকে শুধু আল্লাহর ইবাদত করতেন।

একদিন রাতে তাঁর মনিবের ঘূম ভেঙে গেল। সে জানালা দিয়ে দেখতে পেল, তার ক্রীতদাসী রাবেয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করছে। ওপর হতে একটি বাতি তার ঘর আলোকিত করে রেখেছে। এক পর্যায়ে রাবেয়া মুনাজাত ধরে আল্লাহর দরবারে বললেন, ‘হে আল্লাহ তুমি আমাকে কোনো মানুষের অধীন করে না রাখলে আমি সর্বক্ষণ শুধু তোমার ইবাদত করতাম।’ রাবেয়ার মনিব এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং সকালবেলা তাঁকে C^{vii}i প্রাথীন করে দিল। তিনি জীবনে বিবাহ করেন নি। কেবল আল্লাহর ইবাদতে জীবন কাটিয়ে দেন।

আল্লাহর ওপর আস্থা ও ইবাদত

তাপসী রাবেয়া বসরি (র.) আল্লাহর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বসবাস করতেন। তবু কোনো মানুষের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। হ্যরত রাবেয়া বসরি অসুস্থ হলে আব্দুল ওয়াহিদ আমর ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরি তাঁকে দেখতে যান। তখন সুফিয়ান সাওরি হ্যরত রাবেয়া বসরিকে বললেন, যদি আপনি মুখ খুলে বলেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করে দেবেন। রাবেয়া বললেন, হে আবু সুফিয়ান আপনি কি জানেন না কার ইচ্ছায় আমার এ অসুস্থতা? যাঁর B^{vii}i তিনি কি আল্লাহ নন? সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, তাহলে কেন আমাকে আল্লাহর B^{vii}i বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে বলছেন!

মালিক বিন দিনার নামে এক লোক রাবেয়া বসরির পরিচিত ছিল। তিনি একদা রাবেয়ার আর্থিক দুরবস্থা দেখে বললেন, আপনি বললে আমি আমার এক ধনীবন্ধু হতে আপনার জন্য সাহায্য আনতে পারি। রাবেয়া বললেন, হে মালিক! আমাকে এবং আপনার বন্ধুকে কি আল্লাহই রিয়িক দেন না? মালিক বলল, হ্যাঁ! রাবেয়া বললেন, আল্লাহ কি দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের কারণে ভুলে যাবেন? এবং ধনীদেরকে তাদের abm^{viii}i কারণে মনে রাখবেন? মালিক বলল, না। তখন রাবেয়া বললেন, আল্লাহ যেহেতু আমার অবস্থা জানেন তখন তাকে আমার আবার স্মরণ করানোর দরকার কী?

আল জাহিয় বলেন, রাবেয়ার কয়েকজন পরিচিত লোক তাঁকে বললেন, আমরা যদি আপনার আত্মীয় স্বজনদের বলি তাহলে তারা আপনাকে একজন ক্রীতদাস কিনে দেবেন। রাবেয়া বললেন, সত্য কথা এই যে, যিনি mg^{vii}i পৃথিবীর মালিক তার কাছেই পার্থিব কিছু চাইতে আমার লজ্জা হয়। অতএব যারা পৃথিবীর মালিক নয় তাদের কাছে কী করে আমি চাইতে পারি?

ইবাদত করার ক্ষেত্রে হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) ছিলেন অতুলনীয়। তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই আল্লাহর ইবাদতে e^{vii}i হয়ে যেতেন। অধিকাংশ সময় তিনি দিনে রোজা রাখতেন আর রাতে নফল নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন যে, ‘হে C^{vii}i আমাকে আমার নিজ কাজে (ইবাদতে) e^{vii}i রাখুন। যাতে আমাকে কেউ আপনার যিকির (স্মরণ) হতে বিমুখ করতে না পারে।’

Ava^{vii}i KZ^{vii}i

শুধু পুরুষরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে এমন নয়। অনেক নারীও আল্লাহর ‘ওলি’ (বন্ধু বা কাছের লোক) হতে পেরেছেন। আল্লাহ তাদের অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়েছেন। হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এরও অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল।

একদা হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) একটি হাঁড়িতে কিছু খাদ্যদ্রব্য রান্না করছিলেন। তার একটি পেঁয়াজের দরকার পড়ে। কিন্তু তাঁর ঘরে কোনো পেঁয়াজ ছিল না। তখন একটি পাখি তার ঠোঁটে করে একটি পেঁয়াজ এনে তাঁর কাছে ফেলে দেয়।

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) একবার শস্য বুনছিলেন। পজগালেরা শস্যক্ষেত্রের ওপর এসে পড়েছিল। তখন রাবেয়া প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আমার প্রভু এ হলো আমার জীবিকা। যদি আপনি চান তাহলে আমি তা আপনার শত্রুদের বা বন্ধুদেরকে দিয়ে দেব।’ তখন পজগালেরা উড়ে পালিয়ে গেল। ওলি হিসেবে তাঁর থেকে আরও অনেক কারামত প্রকাশিত রয়েছে।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.) সদা সর্বদা সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন। তিনি D'Pwffj VI x ছিলেন না। তিনি সর্বদা নিজেকে খুব ZlQ মনে করতেন। আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা চাইতেন, সর্বদা আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা (অনুশোচনা) করতেন। তিনি বলতেন, ‘মুখে মিথ্যা তাওবা করে কী লাভ যদি কাজে তা প্রমাণ পাওয়া না যায়। তিনি সর্বদা আল্লাহর একজন শোকরগুজার (কৃতজ্ঞতাকারিনী) বান্দা ছিলেন। খেয়ে-না খেয়ে, দুঃখে-কফ্টে, সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

ইত্তিকাল

অনেক শুম, কষ্টসাধ্য ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনযাপন করার পর আল্লাহর প্রিয় এই নারী ১৮৫ হিজরি/ ৮০১ খ্রিস্টাব্দে বসরায় ইত্তিকাল করেন। তাঁকে বসরায় দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, মুহাম্মদ বিন তুসী নামক এক লোক তার কবরে যান। গিয়ে বলেন যে, হে রাবেয়া, আপনি গর্ব করতেন যে, উভয় জগতের বিনিময়েও আপনি আপনার মাথা নত করবেন না। আপনি কি সেই উন্নত অবস্থা লাভ করেছেন? জবাবে একটি আওয়াজ এলো—‘আমি যা চেয়েছিলাম তা আমি পেয়েছি।’

হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবন আধ্যাত্মিকতা, KómiinotlVI ও সংযমের আদর্শে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁর জীবনের আলোকে আমাদের জীবন গড়ব। ইহকাল ও পরকালে শান্তি পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার একটি তালিকা তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

Abkjxj bgj K ckk

ক্ষয়স্থান রেণ কর

১. প্রাচীনকালে মিসরীয় বাদশাহদের —— বলা হতো।
২. হ্যরত সুলাইমান (আ.) —— বছর নবুয়তি দায়িত্ব পালন করেন।
৩. হ্যরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর ——।
৪. —— নাযিল হওয়ার পর হ্যরত মুহাম্মদ (স.) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন প্রায় শেষ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. অনেক নারী ও	সহজসরল জীবন যাপন করতেন
২. হ্যরত রাবেয়া বসরি সদা সর্বদা	আল্লাহর ‘ওলি’ হতে পেরেছেন
৩. আল্লাহ সুন্দকে হারাম আর	শরিক করো না
৪. আল্লাহর সাথে কাউকে	বাড়াবাড়ি করো না
৫. ধর্ম নিয়ে	ব্যবসাকে হালাল করেছেন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হ্যরত মুসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২. হ্যরত ঈসা (আ.) mpuK খ্রিস্টানদের ভাস্ত বিশ্বাস কী ছিল?
৩. সংক্ষেপে তুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আদর্শ মানব হিসাবে হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।
২. হাদিস শিক্ষায় হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর অবদান বর্ণনা কর।
৩. হ্যরত রাবেয়া বসরি (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।

eubbePib ckk

1 | KZ mRwi tZ g°v weRq nq?

K. ZZiq

L. CAg

M. mBg

N. Aog |

2 | n̄hiZ ḡm̄ (Av.) KZ eQi eq̄m ইন্দেকাল K̄ib?

- | | |
|--------|--------|
| K. 110 | L. 120 |
| M. 130 | N. 140 |

3 | Ôd̄Züg ḡebō ej t̄Z eß̄iq Ñ

- i. mȳbow` Ø weRq
- ii. mȳúÓ weRq
- iii. û`vqweqvi m̄wÜ

t̄K̄ibñJ m̄wK?

- | | |
|-------------|----------------|
| K. i ii | L. i iii |
| M. ii iii | N. i, ii iii |

নিচের Abf"Q` WU পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তায়েব নাবিলকে বলল, বিদায় হজের ভাষণের অনুসরণ করলে মানব জাতির মুক্তি নিশ্চিত হবে।

৪। তায়েবের বক্তব্যের মাধ্যমে কোন নবির প্রতি সমান প্রদর্শন করা হয়েছে?

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ক. হ্যরত ঈসা (আ.) | খ. হ্যরত মুসা (আ.) |
| গ. হ্যরত মুহাম্মদ (স.) | ঘ. হ্যরত দাউদ (আ.) |

৫। তায়েবের বক্তব্য অনুকরণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে-

- i. k̄wšÍ
- ii. t̄bZZj
- iii. åvZZj

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ii | খ) i iii |
| গ) ii iii | ঘ) i, ii iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

- ১। মুরাদ সাহেব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি এলাকায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ ও বিশেষ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তাঁর ছেলে মুবীন শীতকালীন ছুটিতে বাড়িতে এসে বাবার কার্যক্রমে খুশি হয়। একদিন সকালে ড্রাইংরুমে বসে সে পত্রিকা পড়ছিল। হঠাৎ একই গ্রামের ছেলে তারিক এসে অভিযোগ করল যে, নয়নের গাড়ী তার ধানের ফসল নষ্ট করেছে। তখন তার বাবার অনুপস্থিতিতে উভয়ের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিল যে, শস্যক্ষেত্রে Cেন্টিস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত তারিক নয়নের গাড়ীর দুধ ভোগ করবে। উভয় পক্ষ এ সিদ্ধান্তে খুশি হলো। তার পিতাও তাকে ধন্যবাদ জানাল।
- ক. হ্যারত সুলাইমান (আ.) এর পিতার নাম কী?
- খ. মু'জিজা বলতে কী বুঝায়?
- গ. মুরাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মুবীনের বিচক্ষণতা হ্যারত সুলাইমান (আ.)-এর জীবনাদর্শের আলোকে বর্ণনা কর।
- ২। সুরাইয়ার পিত্রালয়ে কাজ করতে এসে সালেহার সাথে সুরাইয়ার পরিচয় হয়। সালেহা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় করত। সারারাত নফল ইবাদতে কাটাতে গিয়ে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লেও ইবাদতে কোনোরূপ বিরক্ত হতো না। সে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতো না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। সে জীবনে বিয়েও করে নি। পক্ষান্তরে সুরাইয়া ছেটবেলো থেকে পড়াশোনায় e--Í থাকত। বিশেষ করে কুরআন ও হাদিস চর্চাই ছিল তার gj কাজ। স্বামীগৃহে গিয়ে সংসার ও আত্মীয় স্বজনের অধিকার যথাযথ পালনসহ রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে মগ্ন থাকত। সে ছিল সংস্কৃতিমনা, তবে পর্দার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আপস করত না।
- ক. মহানবি (স.) কোথায় বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন?
- খ. ‘সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়’- বুঝিয়ে লিখো।
- গ. সুরাইয়ার কর্মে কোন মনীষীর আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সালেহার জীবনে হ্যারত রাবেয়া বসরি (র.)-এর আদর্শ ফুটে উঠেছে- উক্তিটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২০১৩

শিক্ষাবর্ষ

৮-ইসলাম

তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর
এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়
আল-কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :